শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ
দশম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ • ১৩৯৯

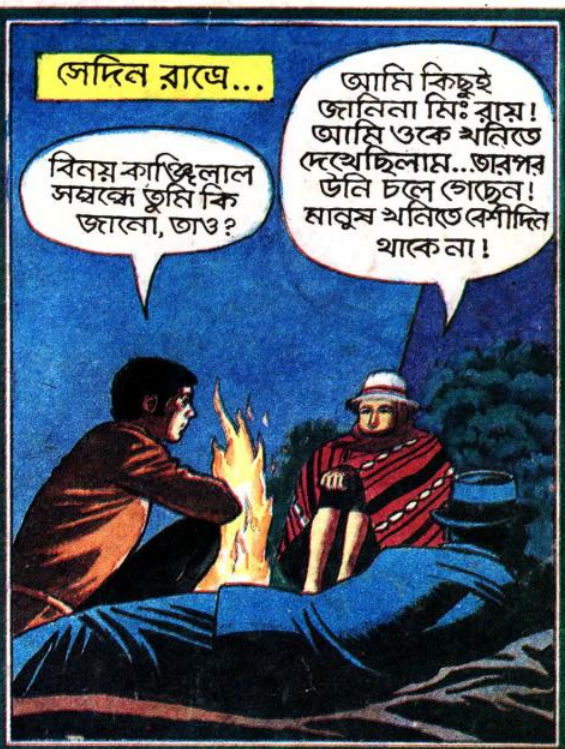

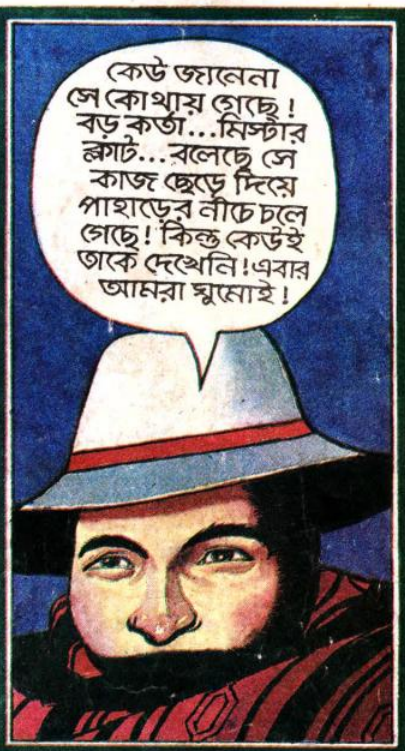

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

কমপ্লান চ্যাম্পিয়ন

সঞ্জয় মঞ্জরেকর-আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টার

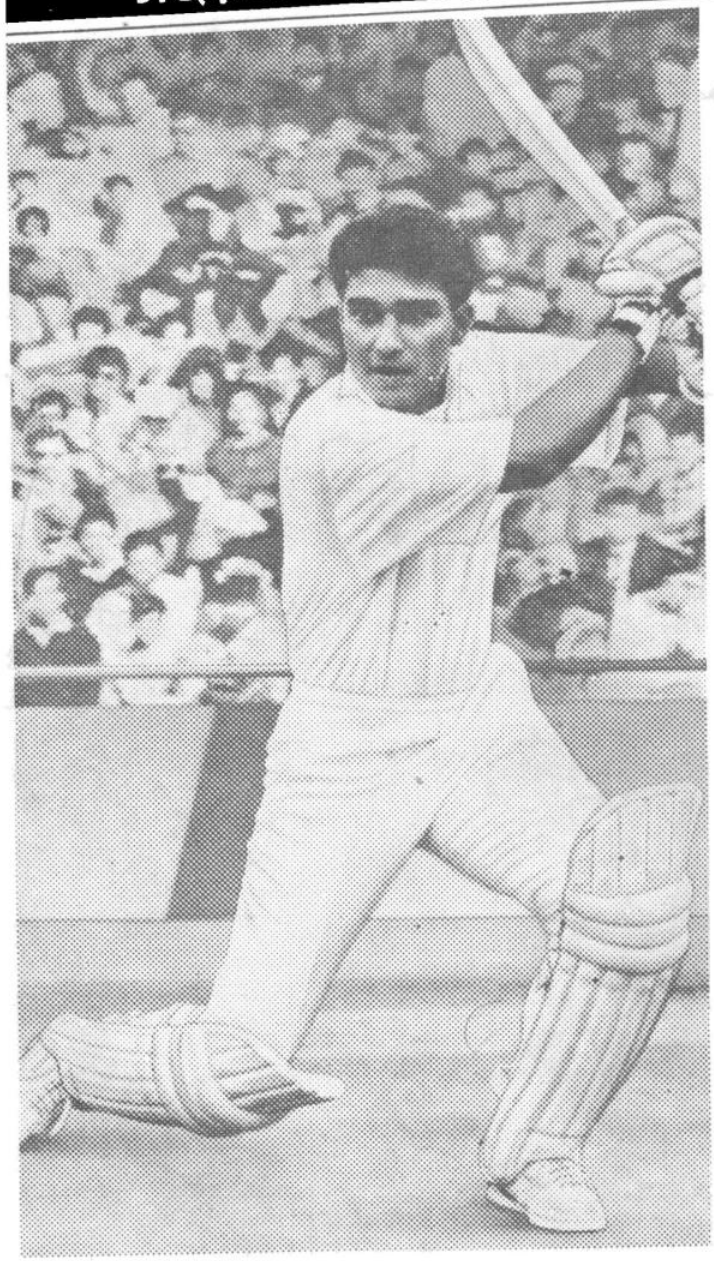

উদীয়মান চ্যাম্পিয়নদের আমি কমপ্লান খেতে পরামর্শ দিচ্ছি। এটি সর্বাঙ্গীন ভাবে সবল-স্বাস্থ্যে বেড়ে ওঠার পক্ষে আদর্শ। আমি তো ছয় বছর বয়স থেকেই নিয়মিত কমপ্লান খাচ্ছি।

সঞ্জয় মঞ্জরেকর

সাধারণতঃ ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়স। আর পুষ্টিদায়ক প্রোটিন হল ছেলেমেয়েদের সবল বাড়ের জন্যে অপরিহার্য। এই কমপ্লান-এ রয়েছে ২০% দুধ প্রোটিন। তাছাড়াও আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ, যার ফলে, ওরা সবল স্বাস্থ্য বাড়ে।

23 সুপরিকল্পিত মাত্রায়, ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX 61/203 BEN R2

বাঁটুল দি গ্রেট

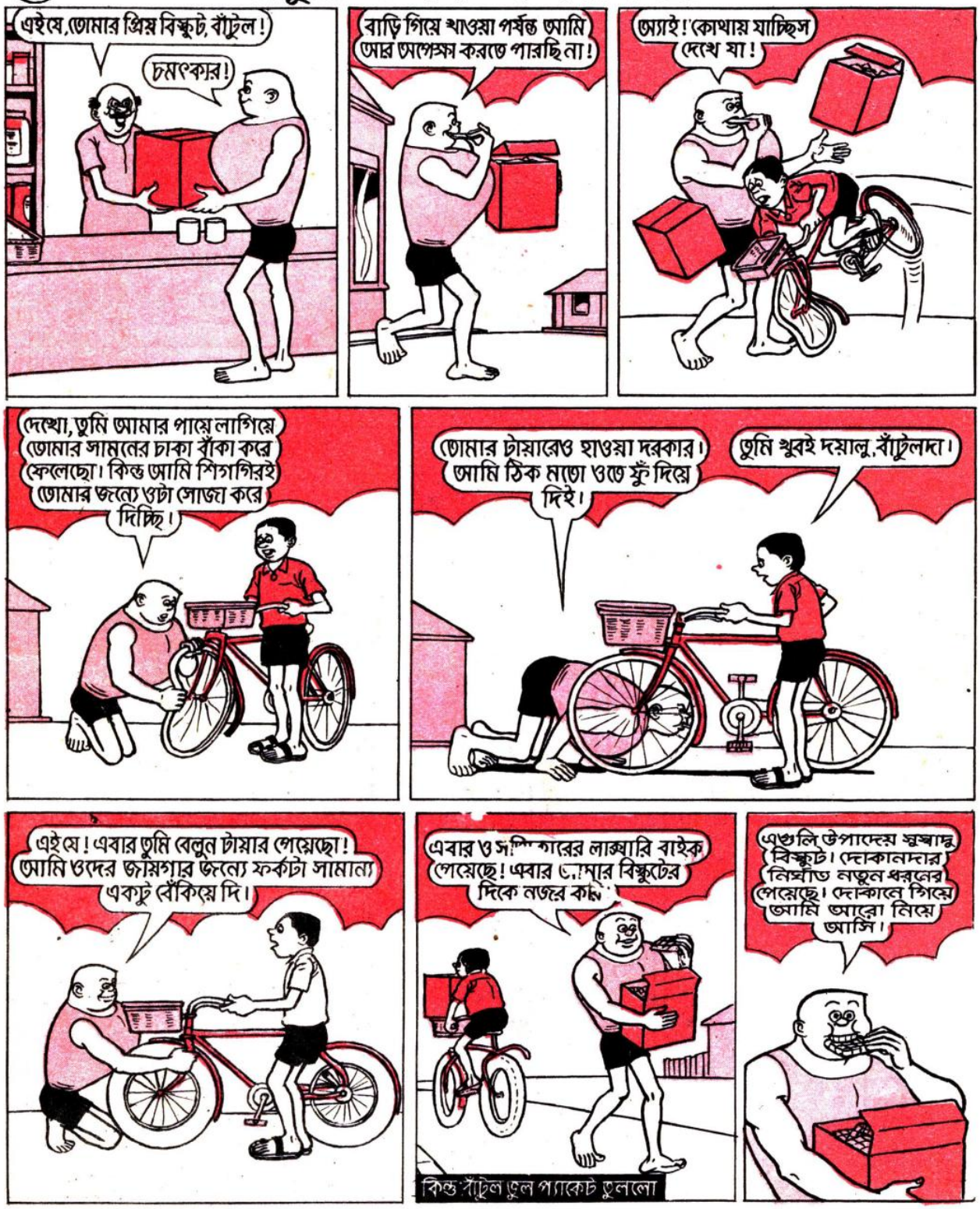

Suk—Nov 1

এই বিস্কুটটাই দেখছি এখন সব থেকে ভালো। আমি এটা আধটন চাই।
কি! মালিক এগুলি আপনার কাছে বেচেছেন? উনি নির্ঘাত কোন ভুল করেছেন!
ওঃহো! হয়তো সে তার সেরা খদ্দেরের জন্যে ওগুলি রেখে দিয়েছে কিন্তু আমি এগুলিই চাই অন্যকোন রকম নয়—বুঝেছো?
হয়ে-হ্যাঁ, বুঝেছি!
ওগুলি বাড়িতে আনার জন্যে আমি দোকানের ঠ্যালা গাড়িটা ধার নিয়েছি!
শুক
শুক
এমন কি এই কুকুরগুলিও গন্ধ শুঁকে বুঝতে পেরেছে যে, এগুলি ভালো বিস্কুট!
দ্যাখ্! কিছু বিশেষ ধরণের সুস্বাদু বিস্কুট আমি দোকান থেকে পেয়েছি—এগুলি আধ টন হবে! আমি এখন ঠ্যালাগাড়িটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।
এখন বাড়ি ফিরে আমার বিস্কুটের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমার অবস্থা কাহিল!
ডাক্তার
হিঃ হিঃ! তোমার বিস্কুট নিয়ে কি ঘটছে সেটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো!
পাড়ার সমস্ত কুকুর এসে এগুলি সব সাফ করে দিলো! ফাঁক মতো আমি দুটো তুলে নি।
কুকুরেরা এগুলির পিছনে ছুটেছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এগুলি কুকুরের বিস্কুট!
ওহ! তাই বুঝি? ঠিক আছে, তবে এবার থেকে এই কুকুরের বিস্কুটই আমি খাবো!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

অগ্রহায়ণ-১৩৯৯, নভেম্বর ১৯৯২

প্রচ্ছদ □
স্বর্ণখনির অন্তরালে
—নারায়ণ দেবনাথ

ধারাবাহিক □
দত্তভিলার অভিশাপ (রহস্য উপন্যাস)—শিশিরকুমার মজুমদার ২২
রক্তসরার দ্বীপ (উপন্যাস)
—রমেন দাস ৮
অরণ্যপতি টারজান (অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী) —সব্যসাচী ২৯

গোয়েন্দাকাহিনী □
কুশীমামা —কাজলকুমার মুখোপাধ্যায় ১২

রূপকথার গল্প □
চিত্রকর —চঞ্চলকুমার ঘোষ ৬

ভূতের গল্প □
ভাঙা কেবিনের ভূত
—বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫

ইতিহাসের গল্প □
বিচিত্র উপহার
—অসীমকুমার ঘোষ ১৮

মহাভারতের গল্প □
কপট তপস্বী —অনাথবন্ধু রায় ৪৭

বিজ্ঞানের গল্প □
ঘাতক —অংশুমান বসু ৫৬

জীবন থেকে নেওয়া □
বাহাদুর স্পাইক —আরতি বসু ৭০

পুরস্কৃত গল্প □
তমালের মা (প্রথম)
—কিংশুক বসু ৬১
মায়ের মমতা (দ্বিতীয়)
—বিশু মিত্র ৬১

অগ্নিযুগের সৈনিক □
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু —চরণ দাস ২৭

ফিচার □
এসো শিখি জাগলিং
—অভয় মিত্র ৫৩

বিশ্ববিচিত্রা □
জিজ্ঞাসা ১৭
সত্যি ৫২

কবিতা □
মনে মনে —চিন্তার্মা চট্টো ৫

ছবিতে গল্প □
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
বাহাদুর বেড়াল (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ৩৫
হাঁদা-ভোঁদা —নারায়ণ দেবনাথ ৫৪
বিলির বুট (রঙিন) ৬৮
ছদ্মবেশে ম্যাম জেল এক্স ৫০

বিভাগীয় লেখা □
খেলা —শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭
ক্লাব পরিচিতি —সুমন ভট্টাচার্য ৪৪
পড়ার সঙ্গে খেলা —চন্দন রুদ্র ৪৫
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম —তুষার শীল ৪৬
দাদুমণির চিঠি ৩২
তোমাদের পাতা ৩৩
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৬৩
কার্টুন —সুফি ৬৪
সুবোধচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার ৪৯

ঘোষণা □
শৈলবালা বল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৬২
জানো কী ৭২

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা।
ডাকে ঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।
Annual Subscription
Bangladesh— Rs. 235.00
U.K. and U.S.A.— By Sea Mail Rs. 327.00
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দাম ঃ ৮ টাকা মাত্র

অফসেটে ছাপা

আফ্রিকার ভয়াল ও ভয়ঙ্কর অরণ্যের অধিবাসী জন্তুদের চরিত্র, প্রকৃতি এবং আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সম্বলিত—

সঙ্কর্ষণ রায়

আফ্রিকার বন্যপ্রাণী

রঙীন ছবিতে পরিপূর্ণ বইটির দাম ১০ টাকা

বাপ্পার অ্যাডভেঞ্চার ॥ মানবেন্দ্র পাল ৯.০০

ছোট-বড়-সবার মনের মত বই

অদৃশ্য জলদস্যু

অনিল ভৌমিক

দাম : ৯.০০

এ-যুগের কয়েকজন দুঃসাহসিক ভারতীয় নিজেদের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে "পাতালপুরী" অভিযানে গিয়ে সমুদ্রতলের এক রহস্যময় দুর্গ আবিষ্কার করল—যে দুর্গ তৈরী করেছিল নিবাত কবচ নামের তিন কোটি অসুর—

পাতালপুরী অভিযান

শিশিরকুমার মজুমদার ৭.০০

লেখকের আর একটি বই

গাগাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ৯.০০

কালিকটের নিকটবর্তী এক গ্রামের পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ একদিন দেখা গেল এক রহস্যময় লাল আলো। রোজ সন্ধ্যেবেলায় প্রায় দু ঘণ্টা ধরে জ্বলত এই আলোটা, শুধু মাসের মধ্যে দু একদিন লালের বদলে দেখা যেতে সবুজ আলোর আভা। এক কিশোর বৈজ্ঞানিক ও তার দুই সহচর কিভাবে জড়িয়ে পড়ল এই আলোর রহস্যে আর কিভাবে উদ্‌ঘাটন করল চমকপ্রদভাবে এক দুরন্ত রহস্যের জট, তাই নিয়েই এই শ্বাসরুদ্ধকর কিশোর রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

পাহাড়ে আলো জ্বলে দেবল দেববর্মা

১৪.০০

লেখকের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী আর একটি কিশোর উপন্যাস ছটি সংখ্যা—৯, ৬, ৩, ৩, ৬, ৯, এই সংখ্যা থেকেই সূত্র পাওয়া গেল রতনের।

নিখোঁজ রতন ১০.০০

পৃথিবীর সবচেয়ে বেপরোয়া অভিযাত্রীর কাহিনী

মুছে গেল পদচিহ্ন

নির্বেদ রায়

দাম : ৮.০[illegible]

অভিশপ্ত চুনার ॥ প্রলয় সে[illegible] [illegible].০০

সোনার নদীর রাজা ॥ ডঃ সত্যপ্রস[illegible] সেনগুপ্ত [illegible].০০

কাবুল আর টাবুল	॥ প্রফুল্ল রায়	৭.০০
হারে-রে-রে	॥ মহাশ্বেতা দেবী	১২.০০
আবিস্কারের গল্প	॥ শচীন দাস	৯.০০
রক্ত মাখা গুপ্তধন	॥ সুজিতকুমার সেনগুপ্ত	৯.০০
কালনাগিনীর আক্রোশ	॥ সংকর্ষণ রায়	৬.০০
রক্তপ্রবাল	॥ ঐ	১০.০০
ভজগোবিন্দের	॥ শঙ্কর রুদ্র	১ম ৮.০০
অ্যাডভেঞ্চার		২য় ১২.০০

প্রতি মুহূর্তে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে গোরাচাঁদকে, সমাজের নিচু তলা থেকে উঠে আসতে হয়েছে লড়াইয়ের আসরে, ডান হাতে তার যেন বজ্র। রাজুদার স্বপ্ন পারবে কি সে সফল করতে...ছড়িয়ে পড়বে তার নাম! বাচ্চা বয়স থেকে কৈশোরের সেই রক্তাক্ত সংগ্রামের কাহিনী। রোমাঞ্চকর অথচ মর্মস্পর্শী।

গোরাচাঁদ মঞ্জিল সেন — ১২

বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ রচনা

অরণ্যের ডাকে

দিলীপ ভট্টাচার্য ১২.০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

শুকতারা

৪৫শ বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● অগ্রহায়ণ ১৩৯৯/নভেম্বর ১৯৯২

মনে মনে

চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

মা যখন বললে,
দুষ্টুমি কোরো না,
ছমছম দুপুরেতে
মিছিমিছি ঘুরো না–
মনে মনে বললুম,
এই আমি চললুম
সব পথ ছাড়িয়ে
যদি যাই হারিয়ে
সারাটা দুপুর তুমি
খুঁজে খুঁজে মোরো না।

যখন সন্ধেবেলা
দিকে দিকে ঝিঁঝি ডাকে
ঠিক দেখো সাড়া দেব
তোমার মিঠুয়া ডাকে,
তখন হাজার খুশি
ফুলে ফুলে মেশামিশি
তখন বাতাসে সুর
প্রাণ করে ভরপুর
তুমি মাগো চাঁদ হয়ে
টিপ দিয়ো আমাকে।

ছবি : সুফি

চিত্রকর

চঞ্চলকুমার ঘোষ

অনেক দিন আগে কোনো এক দেশে থাকত এক চিত্রকর। তার নাম ছিল সোয়েল। গ্রামের শেষ প্রান্তে নদীর ধারে ছিল সোয়েলের বাড়ি। বাড়িতে সোয়েলের সঙ্গে থাকত তার বুড়ী মা।

প্রতিদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে চলে যেত সোয়েল। সারা সকাল জঙ্গলের গাছ কাটত, তারপর কাটা ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে সোজা চলে যেত বাজারে। সেখানে কাঠ বিক্রি করে ফিরে আসত বাড়িতে। বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ত সোয়েল। এবার সঙ্গে থাকত তার রং তুলি কাগজ। কোনো দিন গিয়ে বসত ঝর্ণার ধারে, কোনো দিন ধানক্ষেতের পাশে, কোনো দিন পাহাড়ের কোলে, নদীর ধারে।

চারপাশে যা দেখত, রং তুলি দিয়ে সাদা কাগজের বুকে তারই ছবি আঁকত। আঁকতে আঁকতে এত তন্ময় হয়ে যেত যে কখন দিন পেরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসত জানতেই পারত না সোয়েল। অন্ধকারে যখন আর কিছু দেখতে পেত না তখনই রং তুলি গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

ফিরে মোমবাতির আলোর সামনে বসে ছবির বাকি কাজ শেষ করত। সোয়েলের প্রতিটি ছবি হতো এত সুন্দর, যে দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। পাহাড় নদী ঝর্ণা গাছপালা গরু ছাগল পাখি সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠত সোয়েলের ছবিতে।

একদিন সোয়েল নদীর ধারে বসে ছবি আঁকছে, এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল নদী থেকে উঠে আসছেন অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যা। তাঁর শরীর থেকে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে।

সোয়েল তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে, কে তুমি?

জলকন্যা সোয়েলের সামনে এসে বললেন, আমি জলদেবী, মাঝে মাঝে দেখি তুমি নদীর ধারে বসে একমনে ছবি আঁকছ, তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার একটি ছবি এঁকে দেবে?

সোয়েল বললে, নিশ্চয়ই দেব। তুমি একটু বস, আমি এই ছবিটা শেষ করে নিয়ে তোমার ছবি আঁকব।

নদীর ছবি শেষ করে সোয়েল জলদেবীর ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। ছবি আঁকতে আঁকতে সন্ধ্যে হয়ে এল। সোয়েল বললে, দেবী, আজ আমি যাই কাল আবার আসব, তখন তোমার ছবি এঁকে দেব।

পরদিন আবার সেখানে এল সোয়েল। দেবীও নদীর জল থেকে উঠে এলেন। সারাটা দুপুর ধরে জলদেবীর ছবি আঁকতে থাকে সোয়েল। যখন দেবীর ছবি আঁকা শেষ হলো তখন সূয্যি দেবতা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সোয়েল তার আঁকা ছবি জলদেবীকে দিতেই দেবী আনন্দে বলে ওঠেন, অপূর্ব! তুমি অপূর্ব ছবি এঁকেছো সোয়েল। আমি এত সুন্দর ছবি কোনোদিন দেখিনি। তোমার ওপরে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি সোয়েল। আজ থেকে তুমি যা আঁকবে চাইলে তাই জীবন্ত হয়ে উঠবে।

সোয়েল বলে ওঠে, সত্যি!

জলদেবী বলেন, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখ।

সোয়েল তখুনি কাগজের ওপরে একটা পাখির ছবি এঁকে বলল, তুই সত্যিকারের পাখি হ'। মুহূর্তে কাগজের বুক থেকে বেরিয়ে এল ছবির মতোই ছোট্ট একটা পাখি। তারপর উড়তে উড়তে দূরের আকাশে মিলিয়ে গেল। সোয়েল আবার একটা গরুর ছবি আঁকল, আর তাকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে বলতেই ছবির গরু জীবন্ত হয়ে মাঠে ঘাস খেতে শুরু করে দিল।

আনন্দে দেবীকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে এল সোয়েল। তারপর থেকে যখনই গ্রামের লোকেদের কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তখনই ছবি এঁকে তাকে তাই দিত সোয়েল—কাউকে গরু, কাউকে ছাগল, কাউকে জামাকাপড়, কাউকে বীজ লাঙ্গল। বিনিময়ে কারো কাছ থেকে কিছু নিত না সোয়েল। শুধু যারা এসে টাকা-পয়সা চাইত তাদের ফিরিয়ে দিত সে। বলত আমি কাউকে টাকা-পয়সা দেব না। তোমরা কাজ করে খাও। আমি তোমাদের কাজের

জিনিস দেব। তখন থেকে গ্রামের লোকেদের কাজের জিনিসের সব অভাব দূর হয়ে গেল। আর সবাই সোয়েলকে ভালবাসতে আরম্ভ করল।

এদিকে সেই গ্রামে ছিল এক জমিদার। তার এত টাকার লোভ যে সে আবার মহাজনিও করত। গ্রামবাসীদের কোনোকিছু কেনবার প্রয়োজন হলে তার কাছে আসত টাকা ধার করতে। আর জমিদারও চড়া সুদে তাদের টাকা ধার দিত। সে টাকা সময় মতো শোধ করতে না পারলে গরীব লোকগুলোর জমি-জায়গা সব সে দখল করে নিত। সোয়েল যখন থেকে জিনিসপত্র দিতে আরম্ভ করল তখন থেকে কেউ আর জমিদারের কাছে যেত না টাকা ধার নিতে। ফলে জমিদারের বিষয় সম্পত্তি বাড়াবার পথও গেল বন্ধ হয়ে।

জমিদার দেখল সোয়েলকে না মারলে তার মহাজনগিরি আর চলবে না। সে সোয়েলকে মারবার জন্য তার কয়েকজন লেঠেলকে পাঠিয়ে দিল। তারা সোয়েলের বাড়ির কাছে আসতেই সোয়েল বুঝতে পারল তাকে মারবার জন্য জমিদারের লোক আসছে। সে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে একদল সৈন্য এঁকে তাদের জ্যান্ত হয়ে উঠতে বলল। ব্যস! তার বাড়ি সৈন্যসামন্তে ভরে গেল। সোয়েল তাদের আদেশ দিল, তোমরা জমিদারের লেঠেলদের তাড়িয়ে দাও।

সোয়েলের আদেশ পেয়ে সৈন্যদল জমিদারের লেঠেলদের মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল। তারপর সোয়েল তার সৈন্যদের ছবি মুছে ফেলে দিতেই সব সৈন্যরা আবার মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সোয়েলের সৈন্যদের হাতে লেঠেলরা বেদম পিটুনি খেয়েছে এই খবর পেয়ে রাগে ফেটে পড়ল জমিদার। মারতেই হবে সোয়েলকে, যে ভাবেই হোক।

রাত গভীর হতেই জমিদার তার কয়েকজন লোককে ডেকে বললে, এখন সোয়েল ঘুমিয়ে আছে, তোমরা আস্তে আস্তে গিয়ে ওর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দাও। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক সোয়েল। দেখি কে ওকে বাঁচায়।

জমিদারের লোকেরা বেরিয়ে পড়ল তক্ষুণি। গ্রামের মানুষ তখন সবাই ঘুমিয়ে। জমিদারের লোকেরা গিয়ে সোয়েলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল।

বাড়িতে আগুন লাগতেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল সোয়েলের। সে বুঝতে পারল জমিদারের লোকজন তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি এক টুকরো কাগজে বৃষ্টির ছবি এঁকে সে বলল, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে। অমনি আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল সব আগুন।

পরদিন সকালে সোয়েলকে বহাল তবিয়তে বেড়াতে দেখে যেন ক্ষেপে উঠল জমিদার। ভাবল, বার বার ও ছবি এঁকে নিজেকে বাঁচাচ্ছে এবার ওর ছবি দিয়েই ওকে মারতে হবে। সে তার নায়েবকে ডেকে বললে তুমি সোয়েলের বাড়ি গিয়ে বলবে আমার একটা রাক্ষসের ছবি দরকার। তার ধারণা সোয়েল রাক্ষসের ছবি আঁকলেই সেই রাক্ষস জীবন্ত হয়ে ওকেই মেরে ফেলবে।

নায়েব জমিদারের কথামতো সোয়েলের বাড়ি গিয়ে বলল, জমিদার মশাই একটা রাক্ষসের ছবি চেয়েছেন। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।

সোয়েল মাথা নেড়ে বললে, ঠিক আছে কাল সকালে ছবি পাবে।

সারাদিন ধরে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসের ছবি আঁকল সোয়েল। পরদিন যখন কেউ ছবি নিতে এল না তখন সোয়েল নিজেই চললে জমিদারকে ছবি দিতে। দূর থেকে সোয়েলকে দেখতে

পেয়ে জমিদার ভাবলে, এইবার সুযোগ এসেছে, ওর কাছে রং তুলি কিছুই নেই। আমার বাড়িতে পা দিলেই ওকে মেরে ফেলব।

যেই না সোয়েল জমিদারবাড়িতে ঢুকেছে অমনি জমিদারের লোকজন ওকে মারবে বলে ঘিরে ফেলল।

তখন সোয়েল আর কি করে। প্রণের ভয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, তুই সত্যিকারের রাক্ষস হয়ে যা। সঙ্গে সঙ্গে ছবির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস। বেরিয়ে এসে প্রথমেই জমিদারের চুলের মুঠি ধরে এক আছাড়ে তাকে মেরে ফেলল। পাইক পেয়াদারা তীর-ধনুক লাঠি-সোটা নিয়ে এগিয়ে আসতেই রাক্ষসের মুখ থেকে গলগল করে আগুন বেরিয়ে এল। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল জমিদারের সব লোকজন।

একটানে তখন রাক্ষসের ছবিটা ছিঁড়ে ফেলল সোয়েল। ব্যস হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষস। শয়তান জমিদারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ায় খুশিতে আনন্দে গ্রামবাসীরা সোয়েলকেই তাদের গ্রামের নতুন জমিদার করে দিলে।

সোয়েল জমিদার হয়ে ঘোষণা করলে, গ্রামের সবাই কাজ করবে আর কাজের যা জিনিস দরকার পড়বে তার কাছ থেকে বিনা পয়সায় নিয়ে যাবে। সোয়েল নিজেও আগের মতোই রোজ সকালে জঙ্গলে যায় কাঠ কাটতে। কাঠ কাটা হয়ে গেলে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দুপুরবেলায় বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারে। তারপর সারাটা দুপুর বিকেল সন্ধ্যে বসে বসে ছবি আঁকে।

ছবি : সৃষ্টি

রক্তসরার দ্বীপ

রমেন দাস

॥ বার ॥

কাদনহাটে নৌকা বাঁধতেই উত্তেজনাটা উপলব্ধি করা গেল। বাঁধের উপর দিয়ে দলে দলে লোক ছুটে চলেছে। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতের লাঠির মাথায় ছুঁচালো লোহার ফলা।

ব্যাপার কি—না নিরঞ্জন কয়ালের গোয়ালঘরে বাঘ আটকা পড়েছে।

বাঘ, কেঁদো বাঘ?

না কর্তা, আসল বাঘ। আপনারা যাকে রয়েল বেঙ্গল বলেন।

বাঘটাকে মারবে নাকি তোমরা? চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন অর্জুন ডাক্তার একটা ধাবমান লোককে।

না বাবু, সরকার থেকে বাঘ মারা মানা। তা ছাড়া গাঁয়ে-ঘরে কারো কি বন্দুক আছে? মারব কি দিয়ে? সদরে খবর গেছে। দেখা যাক্ কী হয়!

যাবি নাকি? অভিকে জিজ্ঞেস করলেন অর্জুন ডাক্তার।

সবাই রাজী। সবাই নেমে পড়ল। শুধু গুণধর রইল নৌকায়।

বাঁধের উপর দিয়ে কিছুটা যেতেই কান্না আর অকথ্য গালাগালির ঝড় এসে ওদের কানে আছড়ে পড়ল। নিরঞ্জন কয়ালের বিধবা বোনটা কাঁদছে আর নেচে নেচে গাল পাড়ছে। বাঘ দুটো গাই গরু মেরেছে কয়ালদের।

লোকে লোকারণ্য। বাচ্চাকাচ্চা থেকে আশী বছরের বুড়ীও জুটেছে। কোমরে পট্টিবাঁধা চৌকিদার হাতে লাঠি নিয়ে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ছে, খবরদার, বাঘের গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে। গরমেন্টের নিষেধ আছে। ঘুমপাড়ানী সায়েব আসুক, তারপর....

এ নিয়ে বচসা বেধে ওঠে। একদলের অভিমত এই মুহূর্তে খুঁচিয়ে ঠেঙিয়ে হতভাগাকে শেষ করা হোক। অন্যদলের ভয়—তাতে না আবার সরকারের কোপে পড়তে হয়!

বাঘটা এসেছে নদী সাঁতরে। আশেপাশে দু-দশ ক্রোশের মধ্যে বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি। হঠাৎ এটা হানা দিয়েছে গ্রামে। মেরেছে সুধাই মণ্ডলের একটা মোষ, নবীন হালদারের একটা বাছুর। তারপর গতরাতে হানা দিয়েছিল নিরঞ্জনের গোয়ালে।

দুটো গাই গরুকেই খতম করেছে। আর মৃত জন্তুটাকে দূরে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা না থাকার জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক—এখানে বসেই ডিনার শুরু করেছিল। কয়ালের ছেলেটা আঁচ পেয়ে দরজার ঝাঁপ বাইরে থেকে আটকে বন্দী করেছে বাঘটাকে। তারপর শোর তুলেছে।

শক্তপোক্ত গোয়াল নিরঞ্জনের। অবস্থাপন্ন জোতদার। বাঘের সাধ্যি নেই সহজে ঘর ভেঙে বাইরে আসে। সুতরাং সারাদিন ঘরের মধ্যে আক্রোশে পায়চারি করেছে আর মাঝে মাঝে গর্জন ছেড়েছে।

এরই মধ্যে এক মজার খেলা আবিষ্কার করেছে পুরঞ্জন—নিরঞ্জনের ছোট ছেলে। অভিরই বয়সী। দরজার একটা ফুটো দিয়ে গোয়ালের ভেতরটা অস্পষ্ট দেখা যায়। সে সেই ফুটোটার দখল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নায়কের মতো। খুব অনুনয়-বিনয় করলে কাউকে চোখ লাগাতে দিচ্ছে এক-আধ মিনিটের জন্য। কী প্রতাপ তার!

ওরা গিয়ে পৌঁছুতেই একটা শোর উঠল। ঘুমপাড়ানী সাহেবের দল এল?

না, আবার কলরবে মেতে উঠল জনতা। একনাগাড়ে গালাগাল দিয়ে চলেছে বিধবা বৌটা।

পুরঞ্জন হঠাৎ অভিকে ডাকল, বাঘ দেখবেন খোকাবাবু, আসুন এদিকটায়....

দরজার ফুটোয় চোখ রেখে অভি দেখল, বাঘটা ঘরের শেষ প্রান্তে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার সামনে গেলেই পাওয়া যায় এ গন্ধ।

আবার একটা শোরগোল শোনা গেল নদীর ধারে—এসে গেছে, এসে গেছে!

বন্দুকধারী দুজন পুলিশ নিয়ে জনা চারেক লোকের একটা দল। তাদের ঘিরে একদল স্থানীয় মানুষ।

কাছে এগিয়ে আসতেই অর্জুন ডাক্তারের মুখে পরিচয়ের হাসি। আসুন আসুন মিস্টার সেন, সবাই আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছে। গ্রামের হয়ে অভ্যর্থনা জানালেন অর্জুন ডাক্তার।

মিস্টার সেন বিস্মিত চোখে বললেন, আরে, আপনি এখানে ডাক্তারবাবু?

এদিক দিয়ে নৌকাপথে যাচ্ছিলাম। আপনাদের অপারেশন টাইগারের কথা শুনে দেখতে এলাম, বললেন অর্জুন ডাক্তার।

বেশ করেছেন ডাক্তারবাবু, বাঘটা কোথায়? মিস্টার সেনের প্রশ্ন।

আজ্ঞে, ঐ গোয়ালঘরে। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা।

অতঃপর প্রস্তুতি চলল। বাঘটা এমন বেকায়দা অবস্থায় বসে আছে যে, দরজা দিয়ে গুলি করা সম্ভব নয়।

অগত্যা গোয়ালঘরের চালে উঠে পড়ল কজন। গোলপাতার জমাট আস্তরণ সরিয়ে একটা ফাঁক করা হলো। মিস্টার সেনও এক সহকর্মীকে নিয়ে এবার উপরে উঠলেন।

বাঘটা এর মধ্যে বিপদের আভাস পেয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় দ্রুত পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে উপরের শত্রুদের থাবা হানতে চাইছে।

প্রথম গুলি ছুঁড়লেন মিস্টার সেন। বাঘটা থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে উপরে তাকাল। দ্বিতীয় গুলিটা লাগতেই প্রচণ্ড চীৎকার করে শূন্যে একটা লাফ দিল। তারপর যেন সারা রাজ্যের ক্লান্তি ওর শরীরে। টলতে টলতে শেষে এক কোণে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে রাজ্যের ঘুম নেমে এল বাঘটার চোখে। শুয়ে পড়ল সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

বাঘটা বিপদের আভাস পেয়েছে।

অভি এবার মনভরে দেখল বাঘটাকে। ডোরাকাটা, কী সুন্দর অথচ কী ভয়ঙ্কর রূপ! রয়েল বেঙ্গলের নামেও একটা রাজকীয় মর্যাদা ভাবে অভি। তারপর জানতে চায়, আচ্ছা সুন্দরবনের বাঘকে রয়েল বেঙ্গল বলে কেন?

অভির প্রশ্ন শুনে হাসলেন মিস্টার সেন। বললেন, খুব ভাল প্রশ্ন রেখেছ তুমি। সচরাচর কেউই এ নিয়ে বড় একটা প্রশ্ন করে না।

সেটা প্রায় একশ বছরেরও আগেকার কথা। তখন আমরা ছিলাম পরাধীন। ভারতবর্ষের শাসক ছিল ইংরেজ। খোদ লণ্ডনের রয়েল ফ্যামিলি থেকে এক যুবরাজ ভারত সফরে এলেন। তাঁর শখ ছিল বাঘ শিকার। সুন্দরবনের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। জেনেছিলেন সুন্দরবন মানেই বাঘের মেলা। তাই কলকাতায় এসে সেই ইংরেজ যুবকের সুন্দরবনে বাঘ শিকারের শখ হলো। যেই কথা সেই কাজ।

অভির আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁ করে গিলছিল মিস্টার সেনের কথাগুলো।

তখন সুন্দরবন ছিল আরও গভীর, আরও বড়। এই ধরো এখনকার সোনারপুর-বারুইপুর ছিল তখন খাস সুন্দরবনের মধ্যে। যুবরাজের শখমতো বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হাতির পিঠে চেপে তিনি সুন্দরবনে ঢুকলেন। তারপর একসময় সত্য সত্যই একটি বাঘ শিকার করলেন। সেই মরা বাঘ নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায়। সাহেবদের সে কি আনন্দ! কলকাতা আনন্দে মেতে উঠল। যুবরাজের নামে জয়ধ্বনি উঠল। বেঙ্গল টাইগার শিকারের কৃতিত্বে আর গৌরবে তাঁরও মুখ-চোখ উজ্জ্বল।

বেঙ্গল টাইগার? কৌতূহলী প্রশ্ন অভির কণ্ঠে।

হ্যাঁ, মিস্টার সেনের উত্তর। তখন সুন্দরবনের বাঘ বেঙ্গল টাইগার নামেই খ্যাত ছিল। লণ্ডনের রয়েল ফ্যামিলি অর্থাৎ রাজপরিবারের লোকের হাতে বেঙ্গল টাইগার শিকার হবার পর থেকেই বেঙ্গল টাইগার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শিরোপা পায়।

তা হলে রয়েল ফ্যামিলির কৃতিত্ব জাহির করতেই বেঙ্গল টাইগারের এই নয়া পরিচয়? অভির মুখে মৃদু বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটল।

মিস্টার সেন এবার তাঁর সঙ্গীদের তাড়া দিলেন। তাঁর নির্দেশে গোয়ালঘরের দরজা খোলা হলো। আটক রয়েল বেঙ্গল তখন বন্দুকের ওষুধে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোনো বোধশক্তি নেই। শক্ত নাইলনের বাঁধনে এবার বেঁধে ফেলা হলো বাঘটাকে। মুখে পরিয়ে দেওয়া হলো একটা জালের মুখোশ।

একটা বাঁশে বাঘটাকে ঝুলিয়ে হৈ হৈ করতে করতে অপারেশন টাইগারের লঞ্চে তুলে দেওয়া হলো।

মারলি না কেন তোরা ওটাকে? আমার দু-দুটো দুধের গরু মেরেছে দুশমনটা। ছেড়ে দিলি কেন তোরা? মার্ মার্, পিটিয়ে মার্—কয়ালের বিধবা বোন তখনও সমানে গাল পেড়ে চলেছে।

॥ তের ॥

কাদনঘাট ছেড়ে অভিদের নৌকা এবার সুন্দরবনের আরেক প্রান্তে। যত এগুচ্ছে নদীও ততই বড় হচ্ছে। ক্রমশ নদীর আকার বিরাটত্ব ধারণ করল। কে একজন বলল, নদী নয় তো, সমুদ্র। ত্রিলোচন তার উত্তরে বলল, তা তো হবেই, সমুদ্রের প্রায় মুখেই এসে পড়েছি। এখান থেকে সাগর আর খুব বেশিদূর নয়।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বিকালের নিস্তেজ সূর্য পশ্চিম আকাশে রঙ ছড়িয়ে সমুদ্রের জল ছুঁইছুঁই করছে, অভি সমুদ্রের রঙ-রূপ দেখে আনন্দে অধীর।

অভি আঁর গঙ্গা সূর্য, সমুদ্র ও আকাশ নিয়ে আলোচনায় মশগুল। এমন সময় অর্জুন ডাক্তারের উদ্বেগময় কণ্ঠস্বর, কীহে ঝড় উঠবে নাকি? পশ্চিমের নির্মেঘ আকাশে যখন পড়ন্ত সূর্যের রঙীন আভা, উত্তরের আকাশ তখন ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে।

উত্তরের দিকে তাকিয়ে ত্রিলোচন বলল, আকাশের গতিক খুব ভাল ঠেকছে না ডাক্তারবাবু। এসময় তো ঝড়-বাদল হয় না। তবুও উত্তুরে আকাশের হাবভাব খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

নৌকা কোথাও বাঁধবে নাকি রাত্রের মতো? জানতে চাইলেন অর্জুন ডাক্তার।

ধারেকাছে তো ডাঙা জমিও দেখছি না। তবে দেখি জোয়ারের টানে যদি চকমণিপুর পৌঁছুনো যায়, বলল ত্রিলোচন।

না, ত্রিলোচনের নৌকা চকমণিপুর পৌঁছুনোর আগেই মাতাল ঝড়ো হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল নৌকার উপর। মুহূর্তে সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। পশ্চিমের সূর্য ততক্ষণে বিদায় নিয়েছে। নদীর জলে ঘোলাটে রঙ। দমকা হাওয়ার তালে তাল মিলিয়ে শুরু হলো ঢেউ-এর নাচন।

অগাধ জলের অপার বিস্তারের মধ্যে ত্রিলোচনের নৌকা একবার উঠছে, একবার নামছে। নৌকার ভেতর কটি প্রাণী এপাশে ওপাশে গড়াচ্ছে। জিনিসপত্র ওলট-পালট। নৌকার এককোণে যে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল, কাত হয়ে পড়ে সেটা নিভে গেছে।

অন্ধকারে অভির হাতে হাত রেখে অর্জুন ডাক্তার বললেন, কীরে, ভয় করছে?

ভয়? না, ঠিক ভয় না—তবে কীসের একটা অনুভূতি যেন বুকের মধ্যে। সে কি মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাবের?

একটা কথা তোকে বলি অভি, মনে রাখিস, বললেন অর্জুন ডাক্তার, জীবনের চলার পথ সবটাই সরল সহজ নয়। মাঝে মাঝে ঝড় উঠবেই। সেই ঝড়কে ভয় না করে তার সঙ্গে পাঞ্জা কষলেই দেখবি ঝড় কেটে গেছে।

আমি ভয় পাইনি কাকু, বলল অভি।

ব্রেভো মাই বয়, পিঠ চাপড়ে বললেন অর্জুন ডাক্তার।

সারারাত ঝড়ের দাপাদাপি। নৌকা কোথায় ভেসে চলেছে বলতে পারে না পাকা মাঝি ত্রিলোচনও। সে শুধু শক্ত হাতে হাল ধরে বসে নৌকা সামলেছে। নিপুণ হাতে রক্ষা করেছে নৌকাটিকে সলিলসমাধির হাত থেকে।

দুর্যোগের রাত্রি শেষে ভোর হয়ে এল। পুব আকাশে আলোর রেখা দেখা দিতে যেন ঝড়ের দাপট কমে এল। বিধ্বস্ত পরিশ্রান্ত ত্রিলোচন মাঝি ডাকল, বাবু, একবার বাইরে আসুন তো। এ আমরা কোথায় এলুম কিছুই ঠাওর করতে পারছি না।

অর্জুন ডাক্তার বাইরে এলেন। সঙ্গে অভি-গঙ্গাও। ততক্ষণে নৌকা এক জঙ্গলের কাছাকাছি। এ যে সুন্দরবনেরই জঙ্গল—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কোন জঙ্গল? অর্জুন ডাক্তার বললেন, নৌকা পাড়ে লাগাও। আমাদের মালপত্রও সব ওলট-পালট। একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার।

এটা বাবু সুন্দরপুর ফরেস্ট। এখানে একটা অফিস আছে ফরেস্টের, বলল বৃন্দাবন, সুন্দরবন যার নখদর্পণে।

আপনারা কোথা থেকে আসছেন? দূর থেকে ভেসে এল এক আশ্চর্য কণ্ঠের জিজ্ঞাসা। নির্জন জঙ্গলে অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর শুনে সকলে সেদিকে তাকাল। দেখল, প্যান্ট-শার্ট পরা সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে।

ঝড়ে পড়েছিলাম। আমরা ভ্রমণকারী, বললেন অর্জুন ডাক্তার।

কী সর্বনাশ, গতরাতের ঝড়ে আপনারা নদীতে ছিলেন? ভদ্রলোক উদ্বিগ্নকণ্ঠে জানতে চাইলেন।

ঠিক নদীতে নয়, কখনো নদীতে, কখনো আকাশে, কখনো বা পাতালে। হাসলেন অর্জুন ডাক্তার, খুব ধকল গেছে মশাই সারারাত।

নৌকা ছেড়ে এবার তাহলে নেমে আসুন তো, আন্তরিক আবেদন ভদ্রলোকের। বিশ্রাম করে গরীবের ঘরে দুটো ডাল-ভাত খেয়ে কাল আবার নৌকা ছাড়বেন।

না, না, সে কী কথা! আমরা এতগুলো লোক, বিব্রত গলায় অর্জুন ডাক্তার আপত্তি জানালেন।

আরে এটা সুন্দরবন, এখানে ওসব শহুরে ভদ্রতা চলে না, বললেন ভদ্রলোক। আমি মশাই এই বাদাবনে পড়ে আছি পেটের দায়ে। একটা আপন লোকেরও দেখা পাই না। আপনাদের পেয়েছি, এত সহজে ছেড়ে দেব! দুদিন থাকুন, ভাল ভাল অনেক জায়গা ঘুরে দেখাব।

ভদ্রলোকের কথায় কী যেন জাদুমাখা আছে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে উপায় নেই। তা ছাড়া বিশ্রামেরও প্রয়োজন।

হাঁটতে হাঁটতে আলাপ হলো। ভদ্রলোকের নাম দিলীপ চক্রবর্তী। এখানকার ফরেস্ট অফিসার। বয়স এমন কিছু বেশি নয়—যুবকই বলা যায়। দারুণ গল্পিয়ে লোক।

কয়েক মিনিটেই জমিয়ে নিলেন দলটির সঙ্গে।

বনের একপ্রান্তে একটি ছোট্ট বাংলো ধরনের বাড়ি। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। সামনের ফুলবাগে রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই ছাড়াও একটি গাছে একগুচ্ছ লাল গোলাপও ফুটে আছে।

বাঃ, ভারী সুন্দর আপনার আস্তানাটা! সপ্রশংস দৃষ্টিতে বললেন অর্জুন ডাক্তার।

আমার আস্তানা বলবেন না—এটা সরকারী ডেরা। বছর দুই আছি, আবার কবে চলে যাব তার ঠিক নেই, বললেন দিলীপবাবু।

সামনের বারান্দায় গোটা কয়েক বেতের চেয়ার। বসা হলো সেখানে। দিলীপবাবু বললেন, দাঁড়ান এবার একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

কাকুর ভীষণ লাক ভাল, বলল অভি, যেখানে যায় সেখানেই খাতির পেয়ে যায়। নইলে কোথায় কী এই সুন্দরবনের অচেনা অজানা জায়গায় কেমন নেমন্তন্ন জুটিয়ে বসল।

একা নয়, বল সবান্ধবে। হেসে উঠলেন অর্জুন ডাক্তার।

শুধু চা নয়। চায়ের সঙ্গে এল মুড়ি, মধু দিয়ে মাখা। বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে অভি বলল, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো বৃন্দাবনদা। মধুমাখা মুড়ির জন্য সেদিন দুঃখ করেছিলে না?

এতগুলো লোক খাবে, বেশি কিছু ঝামেলা করবেন না দিলীপবাবু, বললেন অর্জুন ডাক্তার। বলেন তো আমাদের বৃন্দাবনকে কাজে লাগিয়ে দিই। রান্নাবান্নায় ও খুব এক্সপার্ট!

না, হাসলেন দিলীপবাবু। বললেন, এ ব্যাপারে কারো কোনো সাহায্য চলবে না। এটা আমার মায়ের নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট।

মা? এতগুলো লোকের রান্নাবান্না করবেন একা আপনার মা? ছিঃ ছিঃ এ বড় জুলুম করা হচ্ছে দিলীপবাবু, বললেন অর্জুন ডাক্তার।

(চলবে)

ছবি: বিজন কর্মকার

কুশীমামা

কাজলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে গোলার মেজাজটা বেজায় বিগড়ে যায়। আত্মীয়রা আসুক, যতদিন পারে থাকুক, গোলার কুছপরোয়া নেই; কিন্তু গুরুজন আত্মীয়দের পড়া ধরার, সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন করার বাতিক ঐটাই গোলার অপছন্দ। এই তো সেবার, এখনও তিন মাস হয়নি, বড়মামা বাড়িতে ঢুকে তখনও জুতো খোলেননি, গোলাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করে উঠলেন—বল তো ভাগ্নে, নোবেল পুরস্কারের বয়স কত হলো?

এহেন গুরুজনদের বরদাস্ত করা যায়? যে করে করুক, অন্তত গোলা বরদাস্ত করবে না কোনোদিন।

গুরুজনদের প্রতি গোলার রাগের আরও কারণ সবাই গোলাকে মিঃ ডিটেকটিভ বলে বিদ্রূপ করে। হতে পারে সে গোয়েন্দা গল্পের ভীষণ ভক্ত; শার্লক হোমস্, ফেলুদা, কিরীটি, ব্যোমকেশ আর সন্তু-কাকাবাবুর প্রায় সব অ্যাডভেঞ্চারই তার মুখস্থ, কিন্তু সে নিজেই যে একদিন সত্যি সত্যি নামকরা গোয়েন্দা হবে না তার প্রমাণ কি?

পড়ার ঘরে বসে গোলা তখন কেশব নাগের বই থেকে পাটীগণিতের অঙ্ক কষছিল, এমন সময় মনে হলো একটা রিকশা যেন গেটের সামনে এসে থামল। গোলা তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল বেশ লম্বা চওড়া চেহারার স্মার্ট একজন ভদ্রলোক রিকশা থেকে নামছেন, বয়স বছর তিরিশের মধ্যে। গোলাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক বললেন—খোকা এটা কি শশাঙ্ক চক্রবর্তীর বাড়ি?

গোলাকে 'খোকা' বলে ডাকার জন্য তার একটু রাগ হলো, তার বয়স এখন চোদ্দ চলছে। 'খোকা' বলে ডাকলে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করে। তবু যেহেতু ভদ্রলোক তাদেরই বাড়িতে আসছেন তাই গোলা বলল—হ্যাঁ, শশাঙ্ক চক্রবর্তী আমার বাবার নাম, আসুন।

—থ্যাঙ্ক ইউ—গেট খুলে ভদ্রলোক সোজা বারান্দায় উঠে এলেন।—মা-বাবা কোথায়?

পড়া ছেড়ে গোলাকে বারান্দায় কারো সঙ্গে কথা বলতে শুনে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক কিন্তু হাতের বড় ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে মাকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে বললেন—আমাকে চিনতে পারলে না বুড়িদি, আমি কৌশিক।

মা চিনতে পারলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না, তবু হেসে বললেন—ওহ্ কুশী, সেজমামার ছোট ছেলে তো? তোকে কত দিন দেখিনি, একদম চেনা যাচ্ছে না তোকে, কত রোগা ছিলি তুই ছোটবেলায়।

মায়ের কথা শুনে গোলার মনে হলো মা যেন ইতিহাসের পড়া মুখস্থ বলছেন। হঠাৎ গোলার দিকে চোখ পড়তেই মা বললেন—অ্যাই গোলা, তোর মামা হয় রে প্রণাম কর।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রলোককে প্রণাম করে গোলা। মনে মনে ভাবে কি জানি এখনি আবার কি জিজ্ঞাসা করে বসবে।

মা ভদ্রলোককে যথেষ্ট যত্নটত্ন করলেন, গোলা অবশ্য যতটা পারল এড়িয়ে চলল। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে

ভদ্রলোকের পরিচয় হলো। একটু পরে বাবা ভদ্রলোককে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন।

সন্ধ্যায় একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করল গোলা, যাতে ভদ্রলোক কোনো প্রশ্ন-টশ্ন করার সুযোগ না পান। ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার গোলা মুখোমুখি হলো রাতে খাবার সময়, তবে গোলার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত, গোলার দিকে তেমন মনোযোগ দেননি। হঠাৎ ভদ্রলোক মাকে উদ্দেশ করে বললেন —বুড়িদি, আমি খেয়েদেয়ে একটু বেরুব। রাতে খেয়ে একটু হাঁটাচলা না করলে আমার ঠিক ঘুম হয় না। চিন্তা নেই, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

অবাক হলো গোলা, বেশ মজার লোক তো! লোকে মর্নিং ওয়াকে বেরোয় জানি, কিন্তু নাইট ওয়াক! যাইহোক মিনিট পনেরো পরে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় মা সাবধান করে দিলেন—বেশি দূরে যাবি না, মফস্বলের ব্যাপার, অন্ধকার—সাপখোপ।

—না না, আমার টর্চ আছে। ভদ্রলোক বললেন।

গোলার পাশের ঘরেই ভদ্রলোকের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। গোলা শুয়ে পড়ার প্রায় আধঘণ্টা পরে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশের ঘরের সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল, অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। গোলাও ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে।

পরদিন চেঁচামেচিতে গোলার ঘুম ভেঙে গেল। সকাল হয়ে গেছে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল গোলা। দেখল উত্তেজিতভাবে কি সব বলতে বলতে লোকজন ছুটছে বাজারের দিকে। মা গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের মুখেই গোলা শুনলো ছিন্নমস্তার মন্দিরে আবার একজন খুন হয়েছে কাল রাতে। বাবা আর সেই ভদ্রলোক আগেই মন্দিরের দিকে চলে গেছেন।

ছিন্নমস্তা এই অঞ্চলের বেশ জাগ্রতা দেবী। বাজারের উত্তর দিকের লাল মাটির রাস্তাটা ধরে গেলে প্রায় আধ মাইল হবে। পুরনো আমলের মন্দির। আগে খুব জাঁকজমক হতো, কিন্তু এখন সেসব হয় না। শোনা যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে মন্দিরের খুব ক্ষতি হয়েছিল, সেইসঙ্গে লুঠ হয়ে গিয়েছিল প্রচুর ধনরত্ন। এখন অবশিষ্ট বলতে বিশাল মন্দির আর পাথরের ছিন্নমস্তা বিগ্রহ।

বেশ কিছুদিন আগে ঐ মন্দিরের দুয়ারে একটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। অনেক চেষ্টাতেও পুলিশ সেই লোকটার পরিচয় পায়নি।

গোলা ঠিক করল সেও মন্দিরে যাবে, তাই জামাটা গলিয়ে নেবার জন্যে ঘরের দিকে পা বাড়ালো। হঠাৎ বারান্দায় রাখা এক জোড়া কেডস দেখে চমকে উঠলো সে। গতকাল এই কেডস্ পরেই ভদ্রলোক এসেছিলেন। তখন কেডস্টা ছিল পরিষ্কার। কিন্তু এখন সেটা লাল ধুলোয় ভর্তি। কাল রাতে ঐ কেডস্টা পরেই উনি বেরিয়েছিলেন, আর ঐ লালমাটি একমাত্র বাজার থেকে মন্দিরে যাবার রাস্তাতেই আছে। তাহলে কি ভদ্রলোক কাল রাতে মন্দিরে গিয়েছিলেন? খুনটাও হয়েছে কাল রাতে! তাহলে কি... না, আর কিছু চিন্তা করতে পারলো না গোলা।

মন্দিরের এলাকাটা লোকে লোকারণ্য। পুলিশ এসে মৃতদেহটা নিয়ে গেছে মর্গে। লোকটার গলায় নাকি গুলি লেগেছিল। মন্দিরের পুরোহিত বাজারের কাছেই থাকেন। কাল দুপুরে নিত্যসেবার পর আর ওদিকে যাননি। ভোরে একদল জেলে মাছ ধরার জন্য মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন মন্দিরের দুয়ারে ওঠে প্রণাম করার জন্যে এবং সেই মৃতদেহটা দেখতে পায়। একটু পরেই গোলা বাবা আর সেই ভদ্রলোককে দেখতে পেল। গোলাকে দেখতে পেয়ে বাবা বললেন—তুই কুশীমামাকে নিয়ে বাড়ি যা, আমি বাজার করে যাচ্ছি।

গোলা সেই ভদ্রলোককে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। ভদ্রলোক কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। গোলা লক্ষ্য করল ভদ্রলোককে কাল যতটা স্মার্ট মনে হয়েছিল আজ যেন ততটাই হতাশ মনে হচ্ছে। তাছাড়া ভদ্রলোক কাল রাতে মন্দিরের রাস্তায় গিয়েছিলেনই বা কেন?

—কুশীমামা? গোলাই প্রথম কথা বলল ভদ্রলোকের সঙ্গে।

—কিছু বলবে? ভদ্রলোক সাড়া দিলেন।

—আপনি কাল রাতে মন্দিরে গিয়েছিলেন কেন? কোনো ভণিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল গোলা।

সামনে গোখরো সাপ দেখলেও ভদ্রলোক এতোটা অবাক হতেন না।— তুমি কি করে জানলে? বোঝা যাচ্ছে কাল রাতে মন্দিরে যাওয়ার কথা অস্বীকার করতে চাইছেন না কুশীমামা।

—কাল যে সাদা কেডস্টা পরে আপনি এসেছিলেন, সেটা তখন বেশ পরিষ্কার ছিল, অথচ আজ সকালে দেখলাম সেটা লাল ধুলোয় ভর্তি। আর ঐ লাল ধুলো এই রাস্তায় ছাড়া এ অঞ্চলে আর কোথাও নেই।

দুজনে হাঁটতে লাগলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কুশীমামা ঘাবড়ে

আমি খেয়ে দেয়ে একটু বেরুব।

গেছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে কুশীমামা কথা বললেন—কাল রাতে আমি মন্দিরের কাছাকাছি গিয়েছিলাম, কিন্তু মন্দিরে উঠিনি। ঠিক বলতে পারছি না খুনটা কখন হয়েছে। তবে খুব ভালো হয় তুমি যদি কথাটা আর কাউকে না বল।

রহস্যগল্পের ভক্ত গোলা সত্যিকারের রহস্যের গন্ধ পায়। গোলা কথা দিল—না না, আমি কাউকে বলবো না। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিল সমস্ত কথা সে তার কালো ডায়েরিটায় লিখে রাখবে, যাতে তার কোনো বিপদ ঘটলে ডায়েরি থেকে সবকিছু জানা যায়। গোয়েন্দা গল্পের নায়করা তো এরকমই করে।

বাড়ি পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিল গোলা, তারপর পড়তে বসলো। কুশীমামার ওপর একটা ব্যাপারে গোলা সন্তুষ্ট, যখন তখন পড়া ধরেন না ভদ্রলোক। তবে তিনি মোটেই সুবিধের নন, অন্তত গত রাতের খুনের ব্যাপারে ভদ্রলোকের হাত থাকতে পারে।

দিন দুয়েকের মধ্যেই কুশীমামা সম্বন্ধে অনেককিছু জেনে ফেলল গোলা। কুশীমামা চা-সিগারেট খান না, সিনেমা দেখেন কালে ভদ্রে। খেলাধুলোর খবরাখবর রাখেন, কবিতা আবৃত্তি করেন খুব সুন্দর আর গল্পের বইয়ের পোকা। তবে গোয়েন্দা গল্প ভালোবাসেন কিনা গোলা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

কুশীমামা আসার পর দিন চারেক কেটে গেছে। কিন্তু এখনও ফিরে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত করেননি। কুশীমামা কোনো কাজে এখানে এসেছেন বলে মনে হয় না, আর এখানে বেড়াতে আসারও কোনো কারণ নেই, দেখার মতো সেরকম কিছু নেই এখানে।

বাবা মায়ের কথায় গোলা এসবের আভাস পায়। কুশীমামা প্রায় সবসময় বাইরে বাইরে ঘোরেন, রাত্তিরে খাবার পর ঘুরতে বের হন এবং ফেরেন বেশ রাত করে। বাবা মায়ের সন্দেহটা এই কারণেই। কুশীমামা মায়ের সেজমামার ছেলে হলেও তাঁদের সঙ্গে গোলার মামাদের তেমন যোগাযোগ নেই। তাছাড়া সেজমামা মারা গেছেনও অনেকদিন। এরই মধ্যে হঠাৎ এই কুশীমামার আবির্ভাব এবং তাঁর এই সন্দেহজনক চালচলন বাবা মাকেও বেশ অবাক করেছে।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে গোলা ওর বন্ধু বাপির সঙ্গে বাজারে গেল খাতা কিনতে। ফেরার সময় লক্ষ্য করল এক চায়ের দোকানে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন কুশীমামা। বেশ অবাক হয়ে গেল গোলা। কুশীমামা চা খান না এটাই সে জানত, বাড়িতে মা বারবার বলা সত্ত্বেও কুশীমামা চা খাননি, সেই কুশীমামা দোকানে বসে চা খাচ্ছেন কেন?

বাড়িতে মাকে কথাটা বলতেই মাও বেশ অবাক হলেন। তখন কুশীমামা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই গোলা মাকে বলল, এমনকি সেই প্রথম রাতেই মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারটা পর্যন্ত। গোলা বুঝতে পারলো সব শুনে মা বেশ ভয় পেয়ে গেছেন।

সন্ধ্যাবেলায় বাবা অফিস থেকে ফিরে মায়ের মুখে সব শুনলেন, তারপর ঠিক হলো মা তাঁর সেজমামার ঠিকানায় চিঠি দিয়ে জানতে চাইবেন যে, এখানে যে এসেছে সে সত্যিই কৌশিক কিনা এবং কৌশিক এখন কি করে ইত্যাদি। মা গোলাকে সাবধান করে দিলেন যাতে তাঁরা যে কুশীমামাকে সন্দেহ করছেন সেকথা তিনি যেন টের না পান। গোলা আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলল, যাবার সময় দেখল কুশীমামার ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরটা অন্ধকার। অর্থাৎ কুশীমামা এখন অন্ধকার বন্ধ ঘরে শুয়ে আছেন।

পড়তে বসে কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারল না গোলা। গোয়েন্দা গল্প পড়া যতটা সহজ, একজন বিপজ্জনক লোকের কাছাকাছি থাকা তত সহজ নয়। গোলা ঠিক করল আজ রাত্রে সে কুশীমামাকে অনুসরণ করবে।

রাতে খাবার পরে কুশীমামা রোজই বাইরে যান, ফেরেন অন্তত এক ঘণ্টা পরে। গোলা এবং কুশীমামার ঘর দুটোর সঙ্গে অন্যান্য ঘরের কোনো যোগাযোগ নেই। সামনে খোলা বারান্দা। তাই কুশীমামা যাবার সময় নিজের ঘরে তালা দিয়ে যান, আবার ফিরে এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। গেটে তালা দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

আজ খাওয়ার পরেই গোলা নিজেই ঘরে এসে আলো নিভিয়ে দিল। মা অবশ্য সন্ধ্যেতে বলেছিলেন গোলা যাতে ভেতর ঘরে শোয়। কিন্তু গোলা রাজী হয়নি। আলো নিভিয়ে দরজা অল্প ফাঁক রেখে গোলা কুশীমামার বাইরে যাবার অপেক্ষায় থাকল। মিনিট পনেরো বাদে কুশীমামা বাইরে বেরিয়ে এলেন; হাতে টর্চ, পায়ে কেডস্ যাতে হাঁটার সময় আওয়াজ না হয়। কুশীমামা দরজায় তালা দিলেন তারপর বারান্দা দিয়ে নেমে গেট খুলে বাইরে গেলেন। এবার একটু দাঁড়িয়ে চারদিক তাকিয়ে নিয়ে গেট বন্ধ করে ডানদিকের রাস্তাটা ধরলেন। চাঁদের আলোয় সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গোলাও এবার বাইরে এসে তার দরজাটা ভালো করে বন্ধ করল, কিন্তু তালা দিল না, যাতে সে যে বাইরে আছে কেউ যেন টের না পায়। এবার গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেটটা আগের মতো বন্ধ করেই কুশীমামাকে অনুসরণ করল।

মিনিট দশেকের মধ্যে কুশীমামার পেছনে পেছনে বাজারে পৌঁছে গেল গোলা। অল্প অল্প শীত করছে। বাজারের দোকানগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। গোলা রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেঁটে দোকানের গা ঘেঁষে চলতে লাগল, যাতে দোকানের ছায়ায় তাকে দেখা না যায়। কুশীমামাও যথাসম্ভব সন্তর্পণে হাঁটছেন। মন্দিরে যাবার রাস্তায় না গিয়ে কুশীমামা সোজা হাঁটতে লাগলেন। বাজার পেরিয়ে খানিকটা গিয়ে তিনি থামলেন। কুশীমামার সঙ্গে গোলার দূরত্ব প্রায় হাত পঞ্চাশেক। কুশীমামাকে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে দেখে গোলাও তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। গোলা লক্ষ্য করেছে বাড়ি

থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত কুশীমামা টর্চটা একবারও জ্বালেননি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। মশার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠছে গোলা, অথচ বেশি নড়াচড়া করলে বিপদ। চারদিক অন্ধকার। দূরের বসতির দিকে কিছু কিছু আলো জ্বলছে। স্ট্রীট লাইট বলে কিছু নেই। বেশ খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা। কে বলবে দিনের বেলা এই জায়গাটাই কি প্রচণ্ড রকম জমজমাট থাকে।

হঠাৎ একটা সাইকেল এসে দাঁড়ালো কুশীমামার সামনে।

—ঘোষাল? কুশীমামা জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ। উত্তর দিল সেই লোকটা।

—কিছু খবর আছে? জিজ্ঞেস করলেন কুশীমামা।

—কালই দিন ঠিক হয়েছে।

—আর একটু রাস্তা বেঁধে কাজে নামলে হতো না?

—প্রয়োজন নেই, সব ঠিক হয়ে গেছে। আর দেরি করলে ভুল হবে।

—কটা নাগাদ আসব? কুশীমামা জিজ্ঞাসা করেন।

—এগারোটায় এলেই চলবে।

ঘোষাল লোকটা আর দাঁড়ায় না, সাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে যায়। কুশীমামাও বাড়ির দিকে হাঁটা দেন। গোলা নিজের শরীরটাকে মাটির সঙ্গে সেঁটে দেয়। কুশীমামা তাকে অতিক্রম করতেই গোলা নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে কুশীমামার পেছনে পেছনে বাড়ি ফিরতে থাকে। লোকটাকে কি ভয়ঙ্কর মনে হয় গোলার। সে যে এখনও তাদের কোনো ক্ষতি করেনি এটাই তো আশ্চর্যের! বাড়ি পৌঁছে কুশীমামা গেট দিয়ে ভেতরে গিয়ে গেট বন্ধ করেন, তারপর নিজের ঘরের তালা খুলে ঢুকে যান। গেট খুললে শব্দ হতে পারে এই ভয়ে গোলা নিচু পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলো। সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলো না গোলা। কাল সকালেই বাবা-মাকে খুলে সব বলতে হবে। পুলিশে খবর দিয়ে রাখা ভালো। হতে পারে লোকটা ক্রিমিন্যাল, কোনো অপরাধ করে হয়তো এখানে গা ঢাকা দিয়েছে! তা না হলে হঠাৎ এতদিন পরে মায়ের সেজমামার ছেলে এখানে বেড়াতে আসবে কেন?

সকাল হতেই বাবা-মাকে গতকাল রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল গোলা। বাবা-মা যে বেশ ভয় পেয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হলো না গোলার। দুজনেই অবশ্য গোলার ওপর বিরক্ত। রাতে অত পাকামি করার কি দরকার ছিল গোলার। একটু পরে বাবা থানায় যাওয়াই ঠিক করলেন। বলে গেলেন—যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে বলবে বাজারে গেছি। 'কেউ' বলতে বাবা কাকে বোঝাতে চাইছেন গোলার কাছে তা অস্পষ্ট নয়। এদিকে কুশীমামা তখনও ঘুমোচ্ছেন।

বাবা ফিরে এলেন একটু দেরি করেই। থানার ওসি-কে খোঁজ-খবর নিতে বলেছেন, তবে ওসি ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দিয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়নি। অফিস যাবার সময় বলে গেছেন—সাবধানে থাকবে।

সারাদিন খুব টেনশনের মধ্যে কাটালো গোলা। মা যতটা

কটা নাগাদ আসব?

পারছেন কুশীমামাকে এড়িয়ে চলছেন। কুশীমামাও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পেরেছেন, তাই সারাদিন ঘরের মধ্যেই কাটাচ্ছেন।

সন্ধ্যা হতেই গোলার বুকের মধ্যে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেছে। পড়াশোনা করা আজ আর সম্ভব হয়নি। বাবার নির্দেশে গোলার ভেতরের ঘরে শোয়া ঠিক হয়েছে। যা আশা করা গিয়েছিল ঠিক সেইরকমই ঘটেছে। খেতে বসেই কুশীমামা বললেন—বুড়িদি, আজ রাতে আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, ফিরতে ভোর হয়ে যাবে। চিন্তার অবশ্য কিছু নেই। কাল সকালেই আবার কলকাতায় ফিরতে হবে।

মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবখানা আজ রাতে যা করে করুক, কালই যখন বাড়ি চলে যাচ্ছে তখন আর ভয় কি?

রাত এগারোটা নাগাদ কুশীমামা বেরিয়ে গেলেন। বাবা-মা রীতিমতো চিন্তিত। রাতটা কাটলে হয়। শুয়ে আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে গোলাও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা বাবা-মার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল গোলার। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখল তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। তারই মধ্যে দলে দলে লোক যাচ্ছে ডানদিকের রাস্তাটা দিয়ে। কাল রাতে মন্দিরে একদল ডাকাত নাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। গোলা সঙ্গে সঙ্গে তাকাল কুশীমামার ঘরের দিকে। অবাক হয়ে গেল সে। কুশীমামার দরজা যথারীতি ভেতর থেকে বন্ধ, বোধহয় ঘুমোচ্ছেন। বাবা-মা বেশ ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছেন। গোলাও কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

মন্দিরফেরতা লোকের মুখে শোনা গেল একদল ডাকাত মন্দিরের নিচে এক সুড়ঙ্গে ডাকাতির সব মালপত্র জমা রাখত। তারপর সুযোগ বুঝে সেসব কলকাতায় পাচার করত। ওই করতে গিয়েই কাল সব ধরা পড়ে। মন্দিরের পূজারীও এসব কাণ্ডকারখানার

সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছে। বাবা অবশ্য আজ আর মন্দিরের দিকে গেলেন না, গোলাকেও যেতে দিলেন না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘুম থেকে উঠলেন কুশীমামা। তারপর হাতমুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করে ড্রেস করতে শুরু করলেন। গোলার কাছে পুরো ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে। কুশীমামা যদি ডাকাতদলেরই কেউ হন তবে পুলিশের হাত থেকে পালালেন কি করে? ঘোষাল বলে পরশু রাতের সেই লোকটাই বা কুশীমামাকে কোথায় যেতে বলেছিল?

হঠাৎই একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। পুলিশের গাড়ি দেখে বাবা-মা বেরিয়ে এসেছেন। গাড়ি থেকে থানার ওসিকে নামতে দেখে বাবা এগিয়ে গেলেন—কাল অতগুলো ডাকাতকে ধরলেন কি করে?

—আরে মশাই সবই কৌশিকবাবুর প্ল্যান। আমরা তো শুধু প্ল্যান মেনে কাজ করে গেছি। প্রাইভেট ডিটেকটিভের এরকম ব্রেন মশাই আমি আগে দেখিনি। মিথ্যেই ওঁকে ভয় পেয়েছিলেন।

কৌশিকবাবু, তার মানে কুশীমামা, কুশীমামা ডিটেকটিভ! বেশ লজ্জা পায় গোলা। কুশীমামাকে তারা সবাই কি না ভেবেছে। বাবা-মাও লজ্জা পেয়েছেন।

কুশীমামা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হাসতে হাসতে—আরে চাকলাদার সাহেবের সাহসের তুলনা হয় না জামাইবাবু। কুশীমামা বলতে থাকেন—অবশ্য আমার এই ভাগ্নেটিরও সাহস কম নয়, পরশু রাতে আমাকে বাজার পর্যন্ত ফলো করেছিল।

গোলা লজ্জায় মুখ নিচু করে। গোয়েন্দাদের কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না দেখছি—মনে মনে ভাবল গোলা।

—কিন্তু ডাকাতগুলোকে ধরলে কি করে? বাবা জানতে চান কুশীমামার কাছে। পুলিশের গাড়ি দেখে একদল লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁদের কথা শুনছেন।

কুশীমামা বলতে শুরু করেন—কিছুদিন আগে বিনপুর অঞ্চলের এক চৌধুরী বাড়িতে ডাকাতি হয়। পুলিশ ডাকাতির কিনারা করতে ব্যর্থ হয়। যে কোনো কারণেই হোক ঐ বাড়ির লোকেদের সন্দেহ হয় ডাকাতির মাল এই ছিন্নমস্তার মন্দিরের মধ্যেই গোপন কোনো জায়গায় লুকনো আছে। ওঁরা পুলিশকে সে কথা জানান। কিন্তু পুলিশ মন্দিরে অনুসন্ধানে যেতে ভয় পায়, পাছে এলাকার মানুষের মনে কোনো উত্তজনার সৃষ্টি হয়। এরপর ওঁরা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাকে অর্থাৎ ক্যালকাটা সিক্রেট সার্ভিস সেন্টারের সাহায্য চান। এ ব্যাপারে আমাকেই সংস্থা থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো কুশীমামার কথা শুনছেন। এবার মাকে উদ্দেশ করে কুশীমামা বললেন—যখন শুনলাম তোমরা এখানেই থাকো, তখন ঠিক করলাম তোমাদের কাছেই উঠবো। তাতে আমাকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না, যদিও প্রথম থেকে গোলা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে। আমি যেদিন এসে পৌঁছাই সেদিনই মন্দিরে একটা খুন হয়। লোকটা অবশ্য ডাকাত, ভাগাভাগি নিয়ে মারামারিতে মারা যায়। আর তাতেই আমি নিশ্চিত হই যে আমাদের সন্দেহ ঠিক।

কুশীমামা বলে চললেন—আমি রোজ রাত্রে বেরিয়ে বাজার আর মন্দিরের দিককার আবহাওয়া জেনে নিলাম। কি ধরনের লোক কত রাত পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে এইরকম আর কি। দিনের বেলায়ও বেরুতাম যাতে সবাই ভাবে একটা বেকার ছেলে নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেছে মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। এরপর একদিন আমি আর ঘোষাল, ঘোষাল অবশ্য পুলিশের লোক, মন্দিরের গোপন জায়গাটার সন্ধান পাই। মন্দিরের যিনি পুরোহিত তিনি বাজারের কাছে থাকলেও রোজ রাত্রেই প্রায় মন্দিরে যেতেন। ওঁকে অনুসরণ করে আমাদের কাজটা খুব সহজ হয়ে গেল। এর পরের ব্যাপার খুব সোজা। পরশু রাতেই ঘোষাল আমাকে জানাল যে কালই মন্দির ঘিরে তল্লাশি চালাতে হবে। সেকথা অবশ্য শ্রীমান গোলাও শুনেছে।

—কিন্তু ডাকাতেরা ওদেরই একজনকে খুন করে মৃতদেহটা মন্দিরের দুয়ারে ফেলে রেখেছিল কেন? প্রশ্ন করল গোলা।

—কারণটা খুব সহজ, রাতবিরেতে সাধারণ লোক তাহলে মন্দিরের দিকে যেতে ভয় পাবে। এমনিতেই ফাঁকা জায়গায় ছিন্নমস্তা বা কালীর মন্দির থাকলে লোকে রাত্রে সেখানে যায় না।

—চলুন আপনাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসি—চাকলাদার কুশীমামাকে তাড়া দিলেন। কিন্তু বাবা-মা বাধা দিলেন—সে কি, আর কটা দিন থাকতে হবে। ওখানকার কয়েকজন বাসিন্দাও বললেন—না না কৌশিকবাবু, আপনি কদিন থাকুন, আপনাকে এই জায়গাটা ঘুরে দেখাব।

শেষ পর্যন্ত কুশীমামা রাজী হলেন। মা বললেন—সবাই ভেতরে আসুন, চা খেয়ে যান। চাকলাদার সাহেব সোৎসাহে সম্মতি জানালেন।

চা খাবার কথায় গোলার মনে পড়ে গেল। কুশীমামা তো চা খান না, তাহলে সেদিন বাজারে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন কেন? কুশীমামাকে জিজ্ঞাসা করতেই কুশীমামা একচোট হেসে নিয়ে বললেন—তুমি না গোয়েন্দা গল্পের বই পড়ো, আমার হাতে কাপ দেখেই ধরে নিলে আমি চা খাচ্ছিলাম। আমি আসলে চুমুক দিচ্ছিলাম গরম দুধে। নেশার মধ্যে আমার তো ঐ একটাই।

—তুই সেকথা বলিসনি কেন? মায়ের গলায় অভিমানের সুর।

সবাই ঘরের ভেতরে চললেন। এতক্ষণ বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিলেন তাঁরাও বিকেলে কুশীমামার কাছে আসবেন বলে যে যাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন। গোলার আনন্দ আর ধরে না। আজ সারাটা দিন দারুণ কাটবে।

ছবি: ধ্রুব রায়

জিজ্ঞাসা

প্রশ্নঃ

১। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল ?

২। বিহার ও পশ্চিমবাংলায় যে আদিবাসীরা বাস করে তাদের কি বলে—সাঁওতাল, ভিল, গন্ড না মুন্ডা ?

৩। মহারাষ্ট্রে কোনটি নয়—অজন্তা, ইলোরা, অমরনাথ না এলিফেন্টা গুহা ?

৪। সাতবার এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার কৃতিত্ব কে অর্জন করেছেন ?

৫। ব্রিটেনের সর্বকনিষ্ঠ প্রথম শ্রেণীর অনার্স গ্রাজুয়েটের সম্মানটি সম্প্রতি কাকে দেওয়া হয়েছে ?

৬। ১ মে ১৯৯২ তে এই শিল্পীর একশ চুয়াল্লিশতম জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। বিখ্যাত 'শকুন্তলা' ছবিটি এঁরই আঁকা। কে এই শিল্পী ?

৭। সম্প্রতি আমাদের দেশের কোন রাজ্যে সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে।

৮। তানসেন সম্মান কোন রাষ্ট্র দিয়ে থাকে—উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট না মধ্যপ্রদেশ ?

৯। গিবনস ক্যাটালগ কি বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে ?

১০। এক ধরনের হেলিকপ্টর আর প্যারাস্যুটের কল্পনা করেছিলেন এক মহান চিত্রকর। তিনি কে ?

১১। 'লরেন্স অফ অ্যারেবিয়া' নামে যে ব্যক্তিটি বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর আসল নাম কি ?

১২। আমেরিকার কোন মহিলা মহাকাশচারী প্রথম মহাশূন্যে হাঁটেন ?

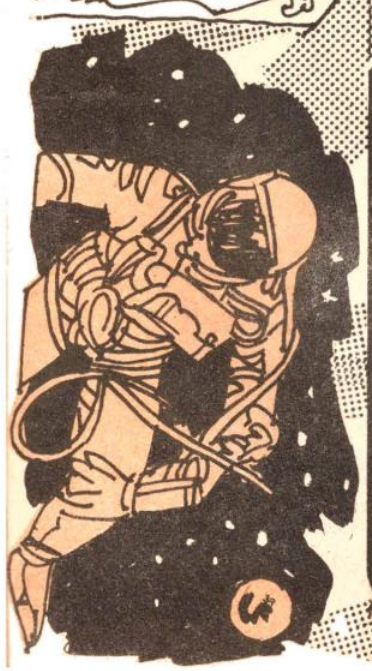

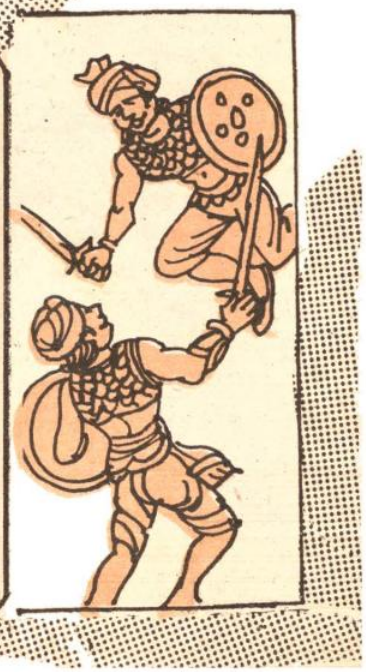

উত্তরঃ

১। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশীতে।

২। সাঁওতাল।

৩। অমরনাথ।

৪। নেপালের আং রিটা।

৫। ব্রিটেনে বসবাসকারী তেরো বছরের তামিল বালক গণেশ সীত্তামপালামকে।

৬। রাজা রবি ভার্মা।

৭। কর্ণাটকে। শিলালিপির সন্ধান মেলে এই রাজ্যের গলবর্গা জেলার সন্নাটি গ্রামে।

৮। মধ্যপ্রদেশ।

৯। পোস্টেজ স্ট্যাম্প।

১০। লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি।

১১। টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স।

১২। ক্যাথি সুলিভান।

ছবিঃ সুফি

বিচিত্র উপহার

অসীমকুমার ঘোষ

শীতটা যেন সেবার একটু বেশিই পড়েছিল। সেদিন জানুয়ারী মাসের দশই। ষোলশো ষোল। সারাদিনের পরিক্রমা শেষে আকাশ রাঙা করে সবে সূর্য ডুবেছে অথচ সম্রাট জাহাঙ্গীরের খাস দরবার যেন এর মধ্যেই রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা তো দরবারের অলংকারের মতো, তাঁরা তো রয়েছেনই, এ ছাড়াও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক আমীর-ওমরাহ, মুনশী-মনসবদার রয়েছেন সবাই। বাদশাহী জাঁকজমকে সম্রাটের খাস দরবার দিনের আলোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছিল। সম্রাট বসে আছেন সোনার সিংহাসনে। তাঁর পোশাকের মহামূল্যবান মণি-মুক্তা, মুকুটের হীরে-জহরত দরবারের উজ্জ্বল আলোয় মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছিল।

সিংহাসনে বসে বসেই সম্রাট দেখতে পেলেন—দরবারকক্ষে প্রবেশ করছেন মুঘল দরবারের ইংরেজ প্রতিনিধি টমাস রো। একটু যেন ক্লান্ত। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। রো-সাহেব বরাবরই মাথা উঁচু করে হাঁটেন, আজই যেন তার ব্যতিক্রম। আসফ খাঁ-র দিকে চেয়ে সম্রাট বললেন—ফিরিঙ্গি সাহেবের তবিয়ৎ খারাপ নাকি?

আসফ খাঁ কুর্নিশ করে বললেন—সম্রাটের হুকুম হলে জেনে আসতে পারি।

জেনে আসতে আর হলো না। রো-সাহেব নিজেই এগিয়ে এলেন। সসম্ভ্রমে বাও করলেন সম্রাটকে, তারপর বললেন, মহামান্য হিজ হাইনেসের তরফ থেকে ভারতসম্রাটকে সামান্য কিছু উপহার পাঠানো হয়েছে। সম্রাট সেগুলি গ্রহণ করলে হিজ হাইনেসের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কৃতার্থ হবেন।

ভারতসম্রাট স্মিত হেসে তাকালেন আসফ খাঁর দিকে। তারপর সম্মতিদানের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

আসফ খাঁ বললেন—সম্রাটকে পেশ করুন কি কি উপহার এনেছেন।

রো-সাহেব কুণ্ঠিতভাবে বললেন—একটি উপহার বাদে অন্য সব উপহারগুলিই আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। শুধু একটি উপহার দরবারে আনা যাবে না। সেটিকে সম্রাটের দরবারকক্ষের বাইরে রেখে আসতে হয়েছে।

বিস্মিত হলেন দরবারের সবাই। কি এমন উপহার যা দরবারে আনা গেল না? হাতী-ঘোড়া না বাঘ-ভাল্লুক!

ভুরু কুঁচকে উঠলো সম্রাট জাহাঙ্গীরের। রো-সাহেব অবশ্য ততক্ষণে বার করে ফেলেছেন তাঁর সঙ্গে আনা উপহারগুলি। লাল ভেলভেটের বাক্স থেকে বেরোল হীরা-মুক্তাখচিত কয়েকটি সুদৃশ্য ছুরি, কয়েক প্রকার বাদ্যযন্ত্র এবং রো-সাহেবের নিজস্ব উপহার একটি তলোয়ার।

জিনিসগুলো যথেষ্ট সুন্দর এবং আকর্ষণীয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই দরবারে হাজির না-করা উপহারটির জন্যই কৌতূহলবোধ করতে লাগলেন। সবারই মন পড়ে রইল দরবারের বাইরে। ঘাড় ঘুরিয়ে অনেকেই উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলেন। এমন কি সম্রাট নিজেও বেশ কয়েকবার তাকালেন দরবার-কক্ষের দরওয়াজার দিকে।

আসফ খাঁ শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন—গোস্তাকি মাফ করবেন সম্রাট, সভা কি আজকের মতন মুলতুবী করা হবে?

সম্রাট হেসে ফেললেন। দাড়িতে দুবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন—তাই তো মনে হচ্ছে হে! মনটা যদি বাইরেই পড়ে রইল, তাহলে সভার কাজ চলে কি করে? আসলে কি জানো, রাজদূত সাহেব, ইংলণ্ডসম্রাটের কাছ থেকে কি উপহার এনেছেন—সেটা সর্বসমক্ষে পেশ না হলে সভার কৌতূহল মিটবে না।

রো-সাহেব ঝানু কূটনীতিক। রাজনীতির পাকা খেলোয়াড়। তিনি এটা ভালই জানতেন যে ছেঁদো কথা, কায়দা-কানুনে ভোলানো যাবে না মুঘল দরবারকে। এখানে রাষ্ট্রদূত তথা রাষ্ট্রের মর্যাদা বিচার হয় উপহারের বহর দিয়ে। তাই রো-সাহেব প্রথম থেকেই চিন্তিত ছিলেন, ইংলণ্ডসম্রাটের এই বিচিত্র উপহারটি ভারতসম্রাটের কেমন লাগবে সেই কথা ভেবে। এইজন্য তিনি আগেভাগেই সুরাটের শাসনকর্তা মুঘল প্রতিনিধি জুলফিকার খাঁকে উপহারটি দেখিয়েছিলেন, তাঁর অভিমত নেবার জন্য। জুলফিকার খাঁয়ের অভিমত অবশ্য নিতান্তই হৃদয়বিদারক। একেবারেই গায়ে জল ঢেলে দেওয়া গোছের। তিনি বলেছিলেন—সম্রাটকে দেবার পক্ষে এ জিনিস নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। জুলফিকার খাঁয়ের অভিমত শুনে ভীষণ দমে গিয়েছিলেন রো-সাহেব। লণ্ডনে তাঁর কোম্পানীকে তিনি এ বিষয়ে বেশ কড়া করে একটি চিঠিও দিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। উপহারগুলি আনার প্রাক্-মুহূর্তেও তিনি মনে মনে সংশয়ের দোলায় দুলেছেন। অন্য উপহারগুলি

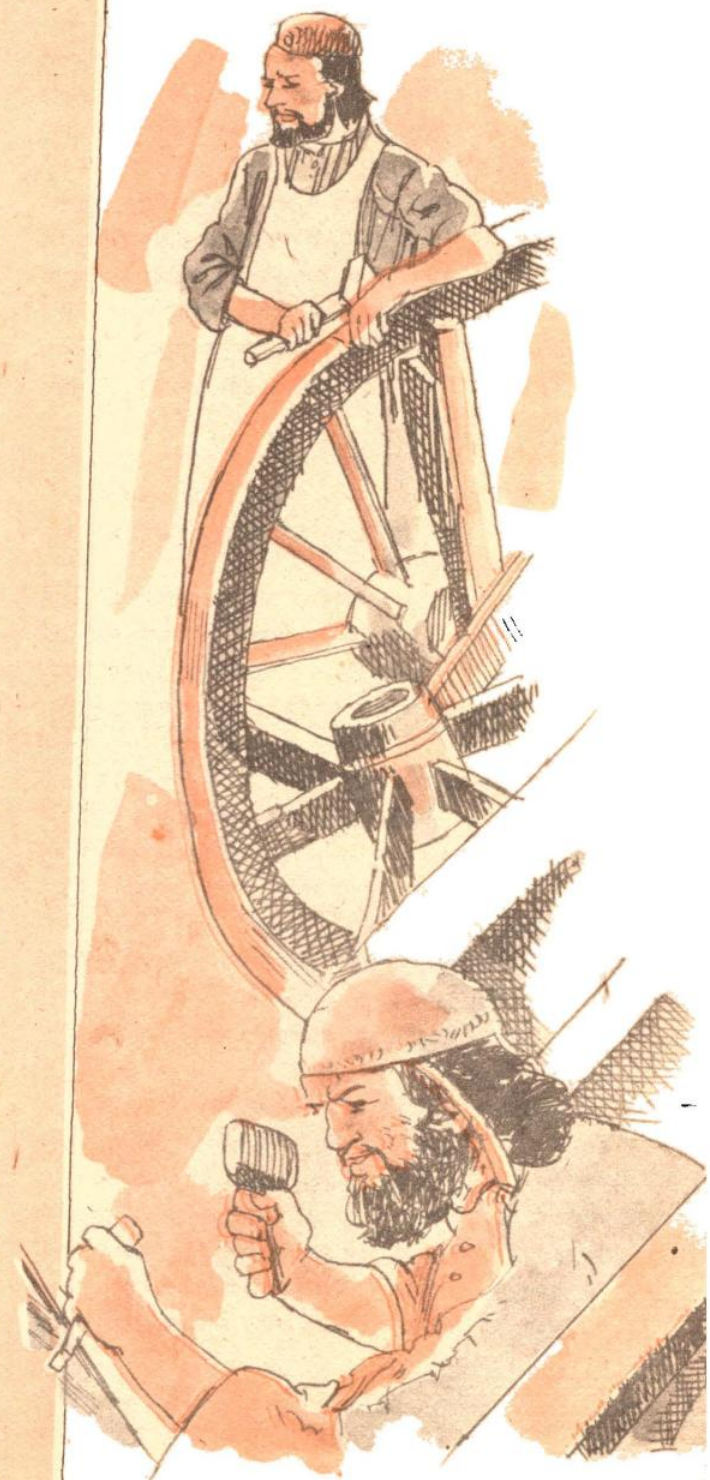

গাড়িটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে ফেলল কারিগরেরা

নয়, তাঁর দ্বিধা ছিল ঐ বিচিত্র উপহারটি নিয়ে। কিন্তু এখন তাঁর স্বভাবজাত রাজনৈতিক দক্ষতার গুণে স্বয়ং ভারতসম্রাটকেও তিনি যেভাবে ঐ উপহারটি সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলতে পেরেছেন, তাতে তাঁর নিজের ওপর আস্থা যেন একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগলো।

তিনি একটু পেছিয়ে গিয়ে আবার সসম্ভ্রমে বাও করলেন সম্রাটকে, বললেন—হে সম্রাট, ইংলণ্ডসম্রাটের পাঠানো উপহারটি আর কিছুই নয়, চার ঘোড়ায় টানা একটি জুড়িগাড়ি। ভারতবর্ষে এই ধরনের গাড়ির এখনও চল হয়নি। সম্রাট অনুগ্রহ করে উপহারটি গ্রহণ করে, এটি পরখ করে দেখতে পারেন। আমাদের হিজ হাইনেস জানেন—সম্রাট বৈচিত্র্য এবং নতুনত্ব বড়ই পছন্দ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর কৌতূহলী হলেন।—চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি? আজীব বাত! দেখো তো হে আসফ খাঁ, চীজটা কেমন?

আসফ খাঁ এবং আমীর-ওমরাহদের মধ্যে কয়েকজন উঠে গেলেন গাড়িটা দেখতে।

রো-সাহেব বললেন—মহামান্য সম্রাটের দরবারে ঐ গাড়ি চালনা করার লোক না থাকার সম্ভাবনা বিবেচনা করে হিজ হাইনেসের আদেশে আমি একজন কোচম্যানকেও এনেছি সম্রাট। আপনার ইচ্ছা হলেই আপনি ঐ গাড়ি চেপে পরখ করতে পারেন।

আসফ খাঁ দলবল সমেত ফিরে এলেন ইতিমধ্যে। সবার মুখেই হাসি। আসফ খাঁ সম্রাটকে তস্‌লিম করে বললেন—সম্রাট, উপহারটি মন্দ নয়। নতুন ধরনের বটে। চাকার ওপর গাড়ি।

সম্রাটের কৌতূহল গেল না। একটু যেন বিরক্তই হলেন আসফ খাঁর উপর। গলার স্বরেই সেটা প্রকাশ পেল। বললেন—বুঝিয়ে বল, আসফ খাঁ।

আসফ খাঁ বিব্রতভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। অন্যান্য আমীর-ওমরাহরাও নিশ্চুপ। একজন ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—সবচেয়ে ভাল হয় মহামান্য সম্রাট যদি নিজে গিয়ে দেখেন।

হঠাৎ আসফ খাঁয়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সম্রাটের সিংহাসনটার দিকে তাকিয়ে, সম্রাটকে কুর্নিশ করে বললেন—গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। আপনার সিংহাসনে দু-জোড়া চাকা লাগিয়ে নিলে আর মাথার ওপরের ঐ জড়োয়ার চাঁদোয়াটাকে সিংহাসনের সঙ্গে চলবার ব্যবস্থা করে নিলে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায়, তা অবিকল ঐ জুড়িগাড়িটার মতন।

সম্রাট তো আহ্লাদে আটখানা। চলন্ত সিংহাসন! তাহলে তো পরখ করে দেখতেই হয়।

সম্রাটের হৃষ্ট মুখ দেখে রো-সাহেব মনে মনে ভীষণ খুশি। ইংলণ্ডের অভিজাত মহলে ঐ ধরনের জুড়িগাড়ির খুব কদর থাকলে হবে কি, মহামান্য ভারতসম্রাটের তা পছন্দ হবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর খুবই সন্দেহ ছিল। যিনি বিশ্বের সবচেয়ে দৌলতশালী সম্রাট, যিনি নিজের জন্মদিনে তাঁর সমান ওজনের সোনা-রুপো-হীরে-মানিক-জহরত দান করে দেন, অশেষ ঐশ্বর্য যে সম্রাটের পায়ের তলায় লুটোপুটি খায়, সেই মুঘলসম্রাট ভারতেশ্বর জাহাঙ্গীর সামান্য একশো একান্ন পাউণ্ড এগারো শিলিং দামের একটা চার ঘোড়ার গাড়ি পেয়ে প্রীত হবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। এখন কিন্তু রো-সাহেবের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। চোখে দেখার আগেই জিনিসটা যে সম্রাটের মনে ধরেছে সে বিষয়ে রো এখন একশো ভাগ নিশ্চিত। শরীরটা পালকের মতো হালকা লাগছিল। সম্রাটের নির্দেশ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ির চালক হোমশেলকে এত্তেলা পাঠালেন।

রাত তখন গভীর। সম্রাট প্রস্তুত হয়ে জুড়িগাড়ি চাপবেন বলে দরবারকক্ষ ছেড়ে বেরোলেন। সঙ্গে আসফ খাঁ, আমীর আবদাল্লা খাঁ, রাষ্ট্রদূত টমাস রো, কোচম্যান হোমশেল এবং খাস দরবারের আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সম্রাট-অনুচর।

দরবারকক্ষ পার হয়েই উপহারটি দেখা গেল। সম্রাট কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইলেন ইংলণ্ডসম্রাট প্রথম জেমসের পাঠানো বিচিত্র উপহারটির দিকে। চার-চারটি দুগ্ধধবল ঘোড়াসহ একটি ঝকমকে এবং বাহারে জুড়িগাড়ি যেন তাঁর জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে।

কিন্তু যতই ঝকমকে আর বাহারী হোক, গাড়ির বহিরঙ্গ কিন্তু সম্রাটকে খুশি করতে পারল না। সম্রাটের চলন্ত সিংহাসন কি এত সাদামাটা হতে পারে? সোনা-রুপো-হীরে-মানিক-জহরত কিছুই নেই! গাড়ির ছাদে নেই কোনো কারুকার্য, জড়োয়ার কাজ। আসফ খাঁর দিকে তাকালেন সম্রাট। গম্ভীর গলায় বললেন—কামারশালার কারিগরদের এত্তেলা পাঠাও।

সম্রাট গাড়িটিতে উঠে বসলেন। গাড়িটির ভিতরের চীনা মখমল দেখে সম্রাট রো-কে বললেন—আপনাদের সম্রাট আমাকে উপহার দেবার জন্য এত দূরদেশ থেকে মখমল না এনে অনেক কাছের দেশ ভারতবর্ষ থেকেই আরও ভালো মখমল পেতে পারতেন।

খানিকটা গাড়ি চেপে ঘুরে আসার পর সম্রাটকে অবশ্য বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছিল।

আসফ খাঁ কুর্নিশ করে বললেন—জাঁহাপনা, কামারশালার প্রধান হাজির।

সম্রাটকে তস্‌লিম জানিয়ে সামনে এগিয়ে এলো একজন।

সম্রাট বিলিতি জুড়িগাড়িটি দেখিয়ে বললেন—তিন দিনের মধ্যে অমন একটা গাড়ি আমার চাই। করে দিতে পারবে?

সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করে কামারশালার প্রধান কারিগর বলল—হুজুরের হুকুম হলে আমরা সব পারি।

—বেশ, হুকুম হলো।

—গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, বিলিতি গাড়িটি কিন্তু সম্পূর্ণ খুলে ফেলতে হবে। আমরা বানানোর কায়দাটা শিখে

নিতে চাই।

—বেশ তো, খুলে ফেল। সম্রাটের হুকুম হলো তৎক্ষণাৎ।

রো বিমর্ষ মুখে বললেন—সম্রাট, না খুলে কায়দাটা শেখা যেতো না? গাড়িটি খুলে যদি ওরা নষ্ট করে ফেলে?

সম্রাট কৌতুকের চোখে তাকালেন রাষ্ট্রদূতের দিকে। বললেন—চিন্তা করবেন না সাহেব। যারা খুলতে পারে, তারা লাগাতেও পারবে।

তবু ভরসা পেলেন না রো। মনটা খারাপ হয়েই রইল। যতই হোক, নিজের দেশের সম্রাটের দেওয়া উপহার তো বটে।

রো-সাহেবের চোখের সামনেই বিলিতি গাড়িটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে ফেলল কারিগরেরা। রো-সাহেবের কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সম্রাটের মর্জি! তাছাড়া ধুরন্ধর কূটনীতিক রো-সাহেব এটা তো জানেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যে সম্রাট খুশ্ তো জগৎ খুশ্! তাই নিরুপায় চিত্তে বিলিতি উপহারটির অঙ্গচ্ছেদ দেখা ছাড়া তাঁর আর উপায় কি! তাই দেখতে লাগলেন বিমর্ষ মনে।

তিন দিনও পুরো গেল না। কারিগরেরা তার মধ্যেই বানালো বটে একখানা দেখবার মতো জুড়িগাড়ি। কোথায় লাগে বিলিতি উপহার! নতুন দিশী গাড়িটির মেঝে হলো সোনা দিয়ে মোড়া। গাড়ির ভিতরটা রুপোর ফুল দিয়ে সাজানো হলো। অঙ্গসজ্জায় বাদশাহী জাঁকজমক আর ঐশ্বর্য ঝলমল করছে যেন। এমন কি ঘোড়া চারটের গায়েও সোনা আর ভেলভেটে মোড়া জিন ঝকমক করছে।

রো-সাহেব অবাক আর মুগ্ধ। হ্যাঁ, এটাকে এখন অনায়াসে ভারতসম্রাটের জিনিস বলে চেনা যাচ্ছে।

সম্রাট বিস্মিত রো-সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। আসফ খাঁ এগিয়ে এসে বললেন—সাহেব, আপনাদের দেওয়া উপহারটির চেহারাও এখন খোলতাই হয়েছে, দেখবেন?

রো ঘাড় নাড়লেন। আসফ খাঁ নিয়ে গেলেন রাষ্ট্রদূতকে কারিগরশালায়। রো দেখলেন—বিলিতি গাড়িটির চেহারাতেও বেশ চেক্‌নাই এসেছে। চীনা ভেলভেট সরে গিয়ে সেখানে বসেছে সোনা রঙের দামী পারসিয়ান ভেলভেট। টিনের পেরেকের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে রুপোর পেরেক। গাড়ির ছাদে সোনা আর জড়োয়ার মোঘলাই কারুকার্য! সে এক এলাহি ব্যাপার! গাড়িটি আগের চেয়ে এখন যেন হাজার গুণ জেল্লাদার হয়েছে।

রো-সাহেব খুশি হলেন। দরবারে ফিরে এসে সম্রাটকে বললেন—সম্রাটের মতো সৌন্দর্যপ্রিয় শিল্পী আর ক'জন আছে? সত্যিই ভারি খুবসুরত হয়েছে আপনার গাড়িটি।

সম্রাট স্মিতমুখে হাসলেন। বললেন—আপনাদের সম্রাট যে গাড়িটি উপহার দিয়েছেন, সেটির ইজ্জতও কম নয়। তাই সেটি আমার সম্রাজ্ঞীকে আমি দিয়েছি। এতে আপনাদের সম্রাট নিশ্চয়ই খুশি হবেন, তাই না? আপনি কি বলেন?

রো-সাহেব বিগলিত হয়ে বললেন—এ তো আমাদের অশেষ সৌভাগ্য সম্রাট।

...রো-সাহেব যেন কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন—সোনা এবং ভেলভেটে মোড়া চারটে দুগ্ধধবল ঘোড়া তাঁদের বিলিতি জুড়িগাড়িটি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর তার ভেতরে বসে রয়েছেন অসামান্যা রূপসী ভুবনমোহিনী এক নারী—তিনি ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

ছবি: ধ্রুব রায়

ছোট-বড় সকলের ভালোলাগার মতো দারুণ চারটি বই
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ২২.০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বই মানেই রহস্য, রোমাঞ্চ আর মজা। তারই পরিচয় মিলবে লেখকের নিজের বাছা এই শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলনের পাতায় পাতায়।
গৌরী দের
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ১০.০০
গা ছমছম করা সব ভূতের গল্প। শিহরন জাগানো প্রত্যেকটি গল্পেই ভয় আর ভালোলাগা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।
সুকুমার ভট্টাচার্যর
মৃত্যুর মুখ থেকে ১২.০০
মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার দুরন্ত সব সত্য ঘটনা।
ভিক্ষু বুদ্ধদেবের
বুড়োর শুধু খাই খাই ৭.০০
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

দত্তভিলার অভিশাপ

শিশিরকুমার মজুমদার

থানার দারোগা বললেন, 'আলোচনা করতে আপনি এসেছেন, আমি কিন্তু আগেই গেছিলাম আপনার কাছে। শুনলাম, এসেই বেরিয়েছেন পাড়া ঘুরতে। এসে ভাল করলেন। ব্যাপারটা আমারও নজরে এসেছে। এসেছে বলেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। পরপর দুজন ওই ঘরেই সাপের কামড়ে মারা পড়েছেন! দোতলার ঘর! পাকা দালান, তার মধ্যে একটা বিশেষ ঘরে দু'দুবার সাপ! এমনি হলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। কিন্তু দুজনেই মারা গেছেন স্থানীয় ব্লক হাসপাতালে। সেখানে ক্ষতস্থান দেখে সাপের কামড় বলে বোঝা গেছে। তাই সাপই যে ওঁদের মৃত্যুর কারণ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই আর! ভাগ্য ওঁদের খারাপ, তাই সাপে কাটার কোনও ওষুধ ছিল না হাসপাতালে। এখন আপনি এসেছেন। শুনলাম, ও বাড়িতেই থাকবেন। তাই এ ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'জানেন তো দত্তভিলা আমাদের পৈত্রিক ভিটা। যে দুজন সাপের কামড়ে মারা গেছেন, তাঁদের প্রথমজন আমার আপন জ্যাঠামশাই। আর দ্বিতীয়জন আমার দাদা। আমরা সবাই শহরেই থাকি। ওঁরা দুজনেও শহরের মানুষ ছিলেন। তবে গ্রামের সঙ্গে আমাদের কিছু সম্পর্ক ছিল। জ্যাঠাই নিয়মিত যাতায়াত করতেন। আমরা কালেভদ্রে আসতাম। আমি খুবই কম। জ্যাঠামশাই বিয়ে করেননি। একা মানুষ তাই এখানে এসে মাঝে মাঝে কিছুদিন থেকেও যেতেন। দাদা অবশ্য গাঁয়ে তেমন আসতেন না। শহরে নিজের ব্যবসাতেই ব্যস্ত থাকতেন। তবে প্রয়োজনে আসতেন। দুএকদিন থাকতেনও। আমি আমার বারো তেরো বছর বয়সে শেষবার এখানে আসি। বাড়িটার ছবি ভাসা ভাসা মনে ছিল। তবে তারপর আর আসিনি এদিকে।

দাদা, জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর কারণ খুঁজতেই এসেছিলেন গাঁয়ে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, সাপে কামড়ানো ব্যাপারটা অস্বাভাবিক! কি করে এমন ব্যাপার ঘটল তাই দেখতেই এসেছিলেন তিনি। তিন-চার দিন থাকবেনও বলে এসেছিলেন। অথচ অজানা কোনও কারণে একুশ দিন থেকে যান! না থাকলে মরতেন না। সেই একুশ দিনের রাতেই তাঁকেও সাপে কামড়ায়! বাড়ি ফিরে যাওয়া তাঁর আর হয়নি।'

'শুনে এলাম রাতে নাকি আপনিও ওই একই ঘরে শোবেন!'বললেন দারোগাবাবু।

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত! পাকাবাড়ির দোতলা ঘরে সাপ! আমি নিজে ও ঘরে শুয়ে দেখতে চাই কোথাও কোনো রহস্য আছে কি না? আজ রাত থেকে ওই ঘরেই থাকব আমি।'

'কাজটা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না?'

'হয়তো হচ্ছে, তবে আমি যথেষ্ট সজাগ থাকব। সঙ্গে অস্ত্র থাকবে, রিভলবার। ও অস্ত্রটা চালানো আমার অভ্যাস আছে। টিপ ফসকাবে না। সাপটা গোখরো, কেরেত, কেউটে বা শঙ্খচূড় যাই হোক না কেন, ঝোলায় তার চিকিৎসার ওষুধ এনেছি। এখানকার ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই ওষুধ পেলে চিকিৎসা করতে পারবেন? আসলে কি জানেন, পৈত্রিক বাড়ি, পূর্বপুরুষদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার স্মৃতি বিজড়িত। আমি চাই না, ও বাড়ির নামে কোনো দুর্নাম রটে। এই আর কি!'

দারোগাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনাদের বংশের ওপরে কি এক অভিশাপ আছে শুনছিলাম, ব্যাপারটা কি?'

দারোগাবাবুর কথায় আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। পরে বললাম, 'হ্যাঁ, আমাদের বংশের

ওপরে একটা অভিশাপ আছে। সে কথা বংশপরম্পরায় আমরা শুনে আসছি। ব্যাপারটা অলৌকিক বলতে পারেন। জানেন তো এ দেশের অধিকাংশ জমিদার বংশের পত্তনের ইতিহাস? কোম্পানির আমলে ডাকাতরা এলাকা দখল নিয়ে তার বদলে কোম্পানিকে নিয়মিত হারে অর্থ যোগান দিত। অর্থলোলুপ কোম্পানি ডাকাতদের আপন আপন এলাকার জমিদার করে দিয়েছিল। জমিদাররাই ছিল তাদের অঞ্চলের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। অন্য কোনো আইন সেখানে চলত না। আমাদের পূর্বপুরুষদের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে কোথায় যেন কোন অঞ্চলে এক ওঝা-গুণিন বাস করতেন। দারুণ ছিল তাঁর নাম ডাক। বহু দূর দূর দেশের মানুষজন আসত তাঁর কাছে ঝাড়ফুঁক করাতে। সাপেকাটা সারাতে, শত্রুর ঘরে সাপ চালান দেবার ব্যবস্থা করতে, মারণ উচাটন মন্ত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। দিকে দিকে তাঁর নাম।

জমিদারি দত্তদের। অথচ, এলাকার তাবৎ মানুষ-জন দত্ত জমিদারবাবুকে মান্য করে না। মান্য করে ওই ওঝা গুণিনকে! জমিদারের খাজনা দিতে দোমনা করে তারা, অথচ ওঝা-গুণিনের কাছে ভেট চড়াতে আটকায় না তাদের। তাছাড়া জমিদারের লেঠেলদের কলা দেখিয়ে বদ প্রজারা গিয়ে আশ্রয় নেয় ওই ওঝা-গুণিনের কাছে। তিনিই নাকি ইচ্ছা করলে জমিদারের খপ্পর থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারবেন!

অগত্যা দত্ত জমিদার বলপ্রয়োগ করেন বাসুকি গুণিনের বিরুদ্ধে। একদল লাঠিয়ালের সামনে বাসুকি গুণিনের কোনো মন্ত্রই কোনো কাজ দেয় না। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হবার আগে তিনি নাকি অভিশাপ দিয়ে যান। আমার বাড়ির বৃদ্ধদের মুখে যা শুনেছি, তাতে অভিশাপের ধরনটা ছিল এইরকম।

"শুনি রাখ দত্ত জমিদার,
বাসুকির কাছে নাই ছাড়!
শত বৎসর মাঝে তাঁর কোপ,
বংশধারা করি দিবে লোপ।"

আমাদের পরিবারের সবারই এসব কথা জানা। আমরা শহরে বাস করি। আমরাই দত্তবংশের মূল ধারা। শহরে তো সাপের ভয় নেই। তাই ওই অভিশাপের ব্যাপারটা আমরা কখনও কোনোভাবে গুরুত্ব দিইনি। ব্যাপারটা আমাদের কারও প্রায় মনেই ছিল না।জ্যাঠামশাই আর দাদা পরপর দুজনেই গ্রামে এসে সাপের কামড়ে মারা গেলেন! আর অবাক কাণ্ড মারা গেলেন পাকা দালানের দোতলায়, যেখানে সাপ আসার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়। এর পরই ওই অভিশাপের কথাটা ফের আমাদের পরিবারে চালু হয়েছে।আমি নিজে কিন্তু কোনও অলৌকিকে বিশ্বাস করি না। সে কারণেই এই ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবছি। এসেছি এখানে, ব্যাপারটা কি দেখতে।' এসব কথা বলে আমি থামলাম।

দারোগাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি সত্যিই অলৌকিকে বিশ্বাস করেন

না? ঘটনা দুটোর সঙ্গে অভিশাপের কোনও সম্পর্ক নেই মনে করেন?'

আমি অবাক হয়ে দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি করেন নাকি? এই বিংশ শতাব্দীতে ওসব কি বিশ্বাস করা সম্ভব?'

লজ্জা পেলেন দারোগাবাবু। মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না, বিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই নেই। ওসব বোগাস! কিন্তু না করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক প্রশ্ন ওঠে মনে। রহস্য ঘনিয়েও ওঠে। তাই বলতে চাইছি,আমার কোনো সাহায্য চাইলে আপনি পাবেন। বাড়ির চারপাশে রাতে পাহারাদার দিতে পারি। তারা অন্তত বাইরে থেকে কোনো কিছুকে বাড়ির ভিতরে ঢোকা থেকে আটকাতে পারবে।'

হেসে বললাম, 'সাপটা যে বাইরে থেকে ওবাড়িতে বেড়াতে যাবে কে বলল? তাছাড়া পাহারাদারের পক্ষে মাঝ রাতে দোতলার ঘরে সাপ ধরাও খুব সহজ কাজ হবে না। বেচারা মিছিমিছি দুর্নামের ভাগি হবে। তবে গোপনে আমাকে আপনি সাহায্য করতে পারেন। খুবই গোপনে কিন্তু।'

অবাক দারোগাবাবু বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো।'

'বলতে পারি, যদি কথা দেন, এই আলোচনার বিষয় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউই জানবে না।'

তেমনি অবাক হয়ে দারোগা বললেন, 'তাতে আপনার যদি সুবিধা হয়, কথা দিলাম।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'শুনেছি আপনি বহুকাল এখানে আছেন। তাহলে, এখানকার লোকজন সম্বন্ধে সবকিছুই আপনার জানা। অনেকের রেকর্ডও হয়তো আছে থানায়। ভুবনজ্যাঠা সম্বন্ধে কি কিছু বলতে পারেন? মানে, তিনি লোক কেমন, কোনো রেকর্ড তাঁর নামে আছে নাকি থানায়... মানে, আমি যে কি বলতে চাইছি তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝেছেন। ওঁকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

তেমনি অবাকভাবে দারোগাবাবু বললেন, 'ওদিক দিয়ে ব্যাপারটা কখনও তো ভেবে দেখিনি!' থামলেন দারোগাবাবু। কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'দেখুন, যদি আমার অভিজ্ঞতায় ওঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয় তো বলব, উনি দেবতুল্য লোক। আমি নয়, এ গ্রামের অন্যদের কাছেও আশা করি এই কথাই শুনবেন। তবে, ওঁর একমাত্র ছেলে ভবেনের নামে থানায় রেকর্ড আছে। বাপের কুপুত্র! একেবারে গোল্লায় যাওয়া ছেলে। নেশা-ভাঙ, ঝগড়া-মারামারি কি না করে! সবার সব কাজে ফোঁপরদালালি করা স্বভাব। কারণ তা না করলে জুলুমবাজি করবে কি করে। মানুষের যত দোষ থাকা সম্ভব, সব দোষই আছে তার। বার দুই ফাটকে আটকও ছিল। ভুবনবাবু চোখের জলে অনুরোধ করাতে ছেড়ে দিই।'

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মারাত্মক কোনো অপরাধ কি ও করতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস?'

একটু ভেবে দারোগাবাবু বললেন, 'এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো মারাত্মক অপরাধ ও করেনি। তবে যা ওর চরিত্র, শেষ পর্যন্ত যা খুশি তাই করা ওর পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে।'

আমি বললাম, 'ভবেনদাকে আমি খুব ভাল করেই চিনি দারোগাবাবু। তার কীর্তির সব কথাও আমার জানা। বাবার সামনে থেকে পালাতে ও তো প্রায়ই কলকাতায় আমাদের বাসায় গিয়ে থাকে। তখন কিন্তু সে অন্য মানুষ। অত লেখাপড়া জানা মানুষ, কেন যে স্কুলের অমন চাকরি ছেড়ে বয়ে গেল, কে জানে! মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ওর মনের গভীরে কি যেন একটা গোপন ব্যথা লুকানো আছে! সেই ব্যথাটাই ওকে অমন করে তুলেছে। ওর জন্য আমার দুঃখ হয়।'

দারোগাবাবু বললেন, 'তবুও বলছি, ওর ব্যাপারে সাবধানে থাকবেন।' এ কথা বলে একটু চুপ করে থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, ভুবনবাবুদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি ধরনের, তা কি জানতে পারি।'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'ঠাকুর্দারা তিন ভাই ছিলেন। সুধাকান্ত, রমাকান্ত আর শ্রীকান্ত। সুধাকান্ত ঠাকুর্দার ছেলেও এ গাঁয়েই আছেন তাঁর মার সঙ্গে। আমার আপন জ্যাঠা ছিলেন প্রায় ওঁর সমবয়সী। দেশের এই জ্যাঠা স্বাভাবিক নন। কথা বলতে পারেন না। রমাকান্ত ঠাকুর্দার ছেলেই ভুবন জ্যাঠা। শ্রীকান্ত দত্ত ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। সেদিকে এখন আমি একাই আছি।'

দারোগাবাবু বললেন, 'সুধাকান্তবাবুর ছেলেকে এদিকে সবাই চেনে। আমিও চিনি। তিনি তো বোবা কালা। কিন্তু ওই যাকে বলে হাবা গোবা, তা নন। গ্রামে থেকে তিনি কিছুই করতে পারলেন না। শহর হলে তিনিও অন্য আর পাঁচজনের মতোই কাজের মানুষ হতে পারতেন। আমার কিন্তু আর একটা প্রশ্ন আছে মিস্টার দত্ত, দত্তভিলা বা গ্রামের সম্পত্তির আসল মালিক কে বা কারা?'

আমি হাসলাম, বললাম, 'তাহলে সব কথা খুলেই বলি আপনাকে। আমার ঠাকুর্দার বাবা, ভীষণ রাশভারী মানুষ ছিলেন। তিন ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে শ্রীকান্ত তাঁর বেশি প্রিয় ছিলেন। বড় দুই ছেলেকে গ্রামে দুখানা বাড়ি মাত্র দিয়ে বাদবাকি জায়গা জমি যা কিছু, সঙ্গে মূল বসতবাটি দত্তভিলা, সবই দিয়ে যান ছোট ছেলেকে। কারণ তাঁর বড় দুই ছেলের চালচলন তাঁর মোটেও পছন্দ ছিল না। কাজকর্ম তাঁরা কিছুই করতেন না। নাচ-গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাস-পাশা-দাবা খেলে সময় কাটাতেন। আমার ঠাকুর্দা কিন্তু ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছু না কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সম্পত্তির কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। নিয়মিত কাছারীবাড়িতে গিয়ে হিসাবপত্র দেখতেন।

তাছাড়া বড় দুই ভাইয়ের সব দায়-দায়িত্বও সম্পত্তির আয় থেকেই চালাতেন। কোনো দিনও বুঝতে দেননি যে, সম্পত্তিতে তাঁদের কোনো হক নেই। পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অবশ্য ভাঙন ধরে। দত্ত-পরিবারের সবকিছুই তারপর ওলটপালট হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হয়। জমিদারি প্রথা লোপ পায়। স্বভাবতই জমিদারির আয় অনেক কমে যায়। আমার বাবা সরকারি চাকরি নিয়ে প্রথম থেকেই বাড়ি ছাড়া ছিলেন। তাছাড়া আমাদের পরিবার ঠাকুর্দার আমলের পরই দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা বাঁধে। জ্যাঠামশাই পড়াশুনা নিয়ে থাকতেন। মহাপণ্ডিত ছিলেন। বাবা দেশ বিদেশে চাকরি করে ঘুরে বেড়াতেন। শহর কলকাতায় আমাদের দেখাশুনা করতেন জ্যাঠামশাই। আমরা তাঁর খবরদারিতেই মানুষ হয়েছি। রিটায়ার করে বাবা কলকাতায় এসে পাকাপাকিভাবে বসেন। তবে তিনি তারপর আর বেশিদিন বাঁচেননি। দেশ ছাড়ার সময় আমাদের দেশের সম্পত্তির অংশের দেখাশুনার ভার স্বভাবতই ভুবনজ্যাঠার ওপর বর্তায়। জ্যাঠামশাই মাঝে মধ্যে গ্রামে এসে কিছুদিন থেকে যেতেন। দেশের সম্পত্তির যা কিছু সবই তিনি নির্দেশ দিয়ে ভুবনজ্যাঠাকে দিয়ে করাতেন। ওব্যাপারে বাবা কোনোদিন কিছু বলতেন না। বাবার অবর্তমানেও তিনিই এদিকের সব ব্যবস্থার ওপর নজর রাখতেন। আমাদের অনেকবার বলেছেন, সবকিছু বুঝে নিতে। দাদাকে জোর করে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। এক আধবার নিজে গ্রামে না এসে, দাদাকেই পাঠিয়েছেন গ্রামে ভুবনজ্যাঠার কাছে কাজ শিখতে।

কি জানি কি হয়েছিল, কিছুদিন আগে, কজন মাতব্বর গ্রামবাসী কি সব ব্যাপারে নালিশ জানান জ্যাঠার কাছে। এই নালিশ জানাতে তাঁরা এসেছিলেন কলকাতায়! জ্যাঠামশাই এরপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রামে

এখানকার সম্পত্তির মূল অংশ আপনার।

গেছিলেন সে ব্যাপারে তদারক করতে। আসার আগে আমাদের বলে এসেছিলেন, গ্রামের লেখাপড়া জানা ভদ্রজনদের নজর বড় ছোট। তারা নাকি ভুবনজ্যাঠার নামে যা নয় তাই অভিযোগ করে গেছেন। তিনি নাকি গঞ্জের কোনো মাড়োয়ারীর সঙ্গে জুয়া খেলায় মেতে জমিদারি ওড়াচ্ছেন। জ্যাঠামশাই যদিও এসব কথা বিশ্বাস করেননি। তবুও তাঁকে তদন্তে যেতেই হয়েছিল। কিন্তু কিছু করার আগেই তিনি সাপের কামড়ে মারা যান। এরপর দাদা এসেছিলেন,, জ্যাঠার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে। যে ঘরে জ্যাঠাকে সাপে কামড়ায়, সেই ঘরেই থাকতেন দাদা। ভুবনজ্যাঠা বহুভাবেই তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেকথা দাদাই আমাকে চিঠি লিখে জানান। ভুবনজ্যাঠাও এ ব্যাপারে চিঠি দেন আমাকে, আমি যেন দাদাকে লিখে অনুরোধ করি ওই ঘরে না থাকার জন্য। আমিও পরপর ক'খানা চিঠি লিখে দাদাকে বারণ করি। কিন্তু দাদা ছিলেন দুঃসাহসী, একগুঁয়ে। ওটা আমাদের বংশের ধারা বলতে পারেন। দাদা কারও কথা শোনেন না। তিনিও ওই ঘরেই সাপের কামড় খান। মারাও যান। সম্পত্তির আমাদের অংশের মালিক এখন আমি একা। ভুবনজ্যাঠা কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজে আমার নামে সই নিয়েছেন। শীঘ্রিরই সবকিছু আইনমাফিক আমার হবে। দলিল রেজিস্ট্রি করা হবে। এখন যদি সাপের কামড়ে আমিও মারা যাই, তাহলে সম্পত্তির আমাদের অংশের আইনসম্মতভাবে মালিক হবেন ভুবনজ্যাঠা আর গুঙ্গাজ্যাঠা। অবশ্য গুঙ্গাজ্যাঠার পক্ষে দাবিদার হওয়া কি খুব সহজ ব্যাপার হবে? কে লড়বে ওঁর হয়ে? এত সব কথা ভেবেই আমি আপনার কাছে ভুবনজ্যাঠার সম্বন্ধে গোপন খবর জানতে চাইছিলাম।'

আমি থামতেই দারোগাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা দেখছি খুবই কমপ্লিকেটেড। প্রথমেই বলি, আপনার ভুবনজ্যাঠার নামের ওই অপবাদটা খুব মিথ্যে নয়। এখন যা শুনলাম, তাতে মনে হয় এখানকার সম্পত্তির মূল অংশ আপনার। তার যা আয় তাও তো আপনার। ওঁর নিজের বলতে যা সম্পত্তি আছে, তার আয় বোধহয় তেমন কিছু নয়। অথচ ঘাড়ে অমন একটা অপদার্থ ছেলে বোঝার মতো চেপে আছে। হয়তো এই সব কথা ভেবেই তিনি বোকার মতো গঞ্জের কুখ্যাত মাড়োয়ারীর পাল্লায় পড়েছিলেন, সহজে কিছু টাকা রোজগারের জন্য। জুয়া খেলা বেআইনি। তবে গঞ্জের ওই মাড়োয়ারীর নামে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো থানাতেই কেউ অভিযোগ তোলেনি। তাছাড়া গঞ্জের থানা আলাদা। তাই ওই মাড়োয়ারীকে নিয়ে আমার করার কিছু ছিল না। তবে, যতদূর খবর পেয়েছি, ওই পাপ চক্র থেকে ভুবনবাবু বার হয়ে আসতে পেরেছেন।'

আমি বললাম, 'আপনার এই খবর পাকা বলে ধরতে পারি?'

হাসলেন দারোগাবাবু। বললেন, 'আমরা বাইরের লোককে কখনও কোনো খবর লিখিতপড়িতভাবে দিই না, যাতে পরে অস্বীকার করার পথ খোলা থাকে। তবে আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে পরে মত ঘোরাবার প্রশ্ন উঠবে না।' বলে কেমনভাবে যেন তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'আপনাদের কেসটা নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি মিস্টার দত্ত। আমরা দুজনে যা জানি ওই ভুবনবাবু সম্বন্ধে, এ গাঁয়ের অনেকেই সেসব কথা ভালভাবেই জানেন। আপনি না থাকলে আপনাদের সম্পত্তির মূল অংশটা ভুবনবাবুর হবে যে একথা অনেকের জানা। এমন অবস্থায় ভুবনবাবু কি তাঁর বাড়ির মধ্যে পরপর দু'দুটো খুন করবেন? যে সম্পত্তির লোভে উনি ওকাজ করবেন, ধরা পড়লে ফাঁসির দড়িতে ঝুলবেন। তখন সম্পত্তি কে ভোগ করবে? সুতরাং সাপে খাওয়ার ব্যাপারে ওঁকে সন্দেহ করে লাভ নেই।'

আমি বললাম, 'তাছাড়া, দেশের যা কিছু তিনিই তো ভোগ দখল করছেন। এ নিয়ে জ্যাঠামশাই কখনও কোনো কথা তোলেননি। দাদাও কিছু বলেননি। আমিও যে কিছু বলব না, তা উনি জানেন। আমি যখন কলকাতা ছেড়ে এখানে এসে থাকব না কোনো দিনও, তখন তো ওঁর সম্পত্তি ভোগ দখলে বাধা হবে না, তা উনি বুঝতেন।'

'আমি, এও শুনেছি', দারোগাবাবু বললেন, 'আপনার জ্যাঠার মৃত্যুর পর, তিনি আপনার দাদাকে ওই ঘরে শুতে দিতে মোটেও রাজী ছিলেন না। এ তো আপনিও জানেন। যার বদ মতলব থাকবে, তিনি কেন এত কাণ্ড করবেন ওই ঘরে শোওয়া নিয়ে?' একটু থেমে, একটু ভেবে দারোগাবাবু বললেন, 'আমার তো মনে হয় সন্দেহ করার মতো মানুষ ভুবনবাবু নন।

বরং ওঁর ছেলেটির যা স্বভাব চরিত্র, তাতে তার পক্ষে এসব কাণ্ড ঘটানো অসম্ভব নয়! আমি বার বার বলছি, ওর সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকবেন। চৌকিদার রাখার কথাও তাই বলেছিলাম আপনাকে। বলেন তো....'

আমি হেসে বললাম, 'যদি সত্যিই কোনো রহস্য থেকে থাকে এর মধ্যে, পাহারাদার বসালে তো সেই অদেখা অজানা খুনী সাবধান হয়ে যাবে। আমার পক্ষে রহস্যভেদ করা আর সম্ভব হবে না।'

'তবুও বলি, খুব বেশি ঝক্কি নিচ্ছেন না কি?' বললেন দারোগাবাবু।

'চিন্তা করবেন না। এখানে পৌঁছেই সকালে আমি গেছিলাম হীরু গুণিনের কাছে। ও কথা দিয়েছে, কাল সকালেই আসবে দত্তভিলায়। চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে কোথাও কোনো সাপ লুকিয়ে আছে কিনা। থাকলে তা ধরে নিয়ে যাবে।'

দারোগাবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'হীরু গুণিন! তার খবর পেলেন কার কাছে?'

'কেন, ভুবনজ্যাঠাই তো বললেন, ও ঘরে থাকবেই যখন ঠিক করেছ তখন হীরু গুণিনকে ডেকে আন। সে দেখে যাক এ বাড়ির কোথাও কোনো সাপ লুকিয়ে আছে কিনা। থাকলে তা ধরে নিয়ে যাক।' তা ওকেও চেনেন নাকি আপনি?' বলে আমি তাকালাম দারোগাবাবুর দিকে।

উনি বললেন, 'লোকটা তেমন ভাল নয়। তবে সাপুড়ে হিসাবে এ তল্লাটে ওর খুবই নাম। সাপ ধরতে, সাপে কাটা সারাতে নাকি ওস্তাদ! এখনও আমাদের খাতায় ওর নাম ওঠেনি বটে, তবে এদিকে সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তার মধ্যে কত জন যে ওর ওঝাগিরির ফলে মরেছে, তা আর কেউ আমাদের জানায় না। গুণিনকে বোধহয় ভয়ও করে সবাই। তাই আমার ধারণা লোকটা ভণ্ড, ভাল নয়, কারণ জেনে বুঝে অন্যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে পেট চালায়। আমার ব্যক্তিগত সন্দেহে ওর নাম আছে।'

আমি হেসে বললাম, 'ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ও কাল এসে দেখে যাবে। ব্যস, তাহলেই ওর ব্যাপারে আমাকে আর ভাবতে হবে না।' কথার শেষে আমি উঠে পড়লাম। দারোগাবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানা থেকে বার হয়ে এলাম।

আজই সকালে এসেছি গ্রামে। এসেই বাড়িতে স্যুটকেশ নামিয়েই গেছিলাম গুণিনের বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে থানায়। ভুবনজ্যাঠাকে বলেছি, ওই ঘরটাই সাফ করে রাখতে। উনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়েছিলেন। আমি শুনিনি।

এখন এখান থেকে যাব গুঙ্গাজ্যাঠার বাড়ি। ওই ঠাকুমার এখন বয়স অনেক। তাঁকে আর গুঙ্গাজ্যাঠাকে দেখেছি আমি অনেকদিন আগে, সেই যে বার শেষ বারের মতো দেশে এসেছিলাম। আমার আপন জ্যাঠামশাই আমাদের সম্পত্তির আয় থেকে ওঁদের জন্য ভাল মতন মাসোহারার ব্যবস্থা করে গেছেন। এখনও পর্যন্ত তা চালু আছে।

থানা থেকে কিছুটা দূরে ওঁদের বাড়ি।

সে দিকেই এগোলাম। হাটতলার মাঝ দিয়ে পথ। সেখানে লোকজনের ভিড়। ভিড়ের মাঝে পৌঁছেছি, হঠাৎ পেছন থেকে আমার নাম ধরে হাঁকাহাঁকি শুরু হলো। বেশ একটা হেঁড়ে গলায়। সে ডাক শুনেই বুঝলাম, এ আর কেউই নয় ভবেনদা!

কাছে এসে ভবেনদা বলল, 'এসেছিস শুনলাম। তা থানায় গেছিলি কেন? ও বেটা দারোগা, বেজায় নটখটি। ও যা বলবে, তার সবটাই বাদ দিবি। দূরে থাকিস বারা ওর থেকে।'

আমি বললাম, 'এখানে এখন তুমি কি করছ? চল না বড় ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আসি?'

ভবেনদা বেজার মুখে বলল, 'চল! ও বুড়ির কাছে যেতে মন চায় না! গুঙ্গাজ্যাঠা কিছু করে না। নিজেদের জায়গা জমিও তেমন নেই। তোরা যা মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিস, তাতে দু'বেলা জোটে ঠিকই, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওখানে গেলে খুব দুঃখ হয় রে। তা তুই এসেছিস কেন? মরতে?'

চলতে চলতে আমি বললাম, 'না, মরব কেন! এসেছি নিজের বাড়িতে থাকতে। তোমার এতে আপত্তি আছে নাকি ভবেনদা?'

থমকে দাঁড়াল ভবেনদা, ঘুরে আমার মুখোমুখি হয়ে দু কাঁধের ওপর দু হাত রেখে বলল, 'ওরে বেটা, তাহলে আমাকে তুই সন্দেহ করছিস! তা, যেভাবে দুজন মরল, সন্দেহ না হলেই তোকে ভাবতাম গাধা। তুই এখন মরলে কার লাভ সব থেকে বেশি বল তো? বলবি না জানি। আমার সম্বন্ধে ও বেটা দারোগা অনেক কিছু বলেছে নিশ্চয়ই। আর বদ গন্ধ কি চাপা থাকে? আমি জানি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোর মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তো বংশের কলঙ্ক। বাপ, প্রায় ত্যাজ্য করেছেন। বাড়ি যাওয়া-আসা এখন প্রায় লুকিয়েই করি। একমাত্র পুত্র তাই আইনসম্মত কোনো ব্যবস্থা করেননি এখন পর্যন্ত। এই অবস্থায় তোকে মারতে পারলে, আমারই ষোলআনা লাভ। সত্যি বলছি, এই উঞ্ছজীবন আর আমার ভাল লাগছে না। বাপটা সাধু! ছেলেটা জানোয়ার! সারা বিশ্ব তো তাই জানে! তোকে আর তাহলে দোষ দেব কি? ঠিক সন্দেহ করেছিস বাপ।'

আমি হেসে বললাম, 'ভবেনদা, খুনী কখনও ঢাক ঢোল বাজিয়ে খুন করে না। তবে, এখনই শুনলাম, তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছ।'

করুণভাবে ভবেনদা বলল, 'কেন করব না বল? মরবি বলেই তো এসেছিস এখানে! এ তো তোর নিয়তির ডাক নয়, এ তো স্বেচ্ছায় ফাঁসির দড়ি গলায় পরা। আমি তো জানি, কি ঘটবে। আর তা ঘটলেই.... তুই এ বংশের অভিশাপের কথা জানিস না? ও তো ঘটবেই।'

এবারে আমি থমকে গেলাম। এ কি বলছে ভবেনদা! কি ঘটবে তা ও জানে! জানে বলেই এত বেপরোয়া কথা বলছে! নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবারে আর আগের মতো কিছু ঘটবে না। তুমি কি ব্যাপারটাকে অলৌকিক কিছু বলে মনে কর? নাকি এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে?'

ভবেনদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দেখ বাপ, ব্যাপারটা ভীষণ গোলমেলে। অলৌকিকে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু বারবার যা ঘটছে, তার তো কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণও খুঁজে পাচ্ছি না। তাই বলছি, যাই হোক না কেন ভাল চাস তো বাপ, রাতে ও ঘরে শুস না। শুলে অবশ্য আমারই ষোলআনা লাভ!'

ভবেনদার এসব কথা কেন যেন আমার মোটেও ভাল লাগল না। যাকে এতদিন সাদাসিধে বখে যাওয়া বোকা ভালমানুষ বলে ভেবেছি, আজ যেন তাকেই অতি চালাক এক অভিনেতা বলে মনে হলো! মনে পড়ল, দাদা একবার এখান থেকে ফিরে গিয়ে বলেছিল, 'ভবেনটা একটা শয়তান, ও না পারে এমন কাজ নেই। জানিস, এবারে, আদায়পত্রের টাকা ছিল আমার স্যুটকেসে, তা থেকে দুশো টাকা তুলে নিয়েছে। ও ছাড়া আর কে নেবে বল? আমি অবশ্য ও নিয়ে খুব হৈচৈ করেছি। কারও নাম তো তুলতে পারিনি, যখন নিজের চোখে কিছু দেখিনি। নেহাত জ্যাঠামশাই মাঝখানে রয়েছেন, তাই কিছু করতে পারছি না। কলকাতায় এলে মিশিস না ওর সঙ্গে।'

ভবেনদা বলল, 'কিরে পথের মাঝে থমকে থেমে রইলি কেন হঠাৎ? চ, চ, আগে বুড়ির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

[চলবে]

ছবি : বিজন কর্মকার

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

চরণ দাস

বাঙালিদের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ জেগে ওঠার মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে। চারদিকে গড়ে উঠেছে নানান প্রতিষ্ঠান। সেই সব প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে সামাজিক কাজকর্ম করছে। গোপনে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কাজ করে চলেছে।

১৯০২ সালে অরবিন্দ এলেন মেদিনীপুরে। তারপরে ১৯০৩ সালে এলেন ভগিনী নিবেদিতা। মেদিনীপুরের সমস্ত গুপ্তসমিতির সঙ্গে বসে তাঁরা দুজনে মন্ত্রণা করে গেলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে। জেগে উঠল মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ।

ঋষি রাজনারায়ণের ভাইপো সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বড়। দুজনেই এগিয়ে এলেন দেশের কাজের জন্য। সত্যেন্দ্রনাথের নাম জানে না কে? কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। প্রথম জীবনে তিনি লাহোরের বিখ্যাত 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সেই কাজ ছেড়ে তিনি চলে এলেন মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কাজ নিয়ে। এলেন, কারণ এখানেই তাঁকে বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি দায়িত্ব পেলেন বিপ্লবী সংগঠনকে পরিচালনা করার।

কাজের ফাঁকে তিনি ছেলেদের খেলাধূলায় উৎসাহ দিতেন। নিজেও ছিলেন টাউন ক্লাবের সভ্য। একবার টাউন ক্লাবের সঙ্গে ডায়মন্ড স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা পড়ল। টাউন ক্লাবের হয়ে খেলবেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ওদিকে ডায়মন্ড ক্লাবে তাঁর কিছু ছাত্র খেলবে। তারা তো চিন্তায় পড়ল কি করে স্যারের সঙ্গে খেলায় টক্কর দেবে। উনি ছাত্রদের ডেকে স্পষ্ট বলে দিলেন স্কুলে তিনি শিক্ষক, মাঠে তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে ওরা যেন তাঁকে সেভাবেই নেয়। না নিলে তারা অন্যায় করবে।

সত্যেন্দ্রনাথ অনেকটা প্রকাশ্যেই কাজ করতেন। কিন্তু বিপ্লবী সংগঠন সম্বন্ধে কথা প্রকাশ হলে ক্ষতি হবে, তাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের কাজ ছিল অতি গোপনীয়। যেসব ছেলেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হতো তাঁরাই জানতে পারতেন জ্ঞানেন্দ্রনাথের পরিচয়।

এমনিতে সবাই তাঁকে একজন সাধারণ শিক্ষক বলেই জানত। ভাবত রাজনৈতিক কোনও কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নেই। অথচ তিনিই ছিলেন বিপ্লবীবাহিনী গঠনের মূল সংগঠক। তাঁর কাছেই বিপ্লবের চূড়ান্ত পাঠ নিতে হতো সব বিপ্লবীকে। এই [illegible] ছিলেন তাঁর ছোট ভাই সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান উপদেষ্টা, [illegible] বিশিষ্ট বন্ধু ও বুদ্ধিদাতা। যাঁরা বিপ্লবমন্ত্রে পুরোপুরি দীক্ষিত হতেন তাঁরাই কেবল জ্ঞানেন্দ্রনাথের পরিচয় জানতে পারতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৯০৫ সাল থেকে মেদিনীপুরের বুকে যে বিপ্লবী আন্দোলন [illegible] তার মধ্যে পুলিশ কখনও জ্ঞানেন্দ্রনাথকে পায়নি।

রাজনারায়ণ বসু

তিনি সাধারণ মানুষের মতোই সব কিছুর বাইরে রয়ে গেলেন। নিরুপায় পুলিশ একদিন তাঁর বাড়ি ঘেরাও করল। এল জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নেলসন, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্নিশ, আর ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মজহরুল হক। এরা সবাই নিশ্চিত খোঁজ নিয়ে এসেছে, বাড়ি ঘেরাও করে হেমচন্দ্রের তৈরি বোমা পাওয়া যাবে। আর তা পেলেই জানেন্দ্রনাথ আর সত্যেন্দ্রনাথকে বন্দী করা সহজ হবে।

পুলিশ খুবই নিশ্চিন্ত ছিল, কারণ কলকাতার বিপ্লবীদের কেন্দ্রের খবর পুলিশ জানতে পেরেছে। মজঃফরপুরের বোমার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। আর এই বিপ্লবীদের মূলঘাঁটি মেদিনীপুরে। তাই বিরাট বাহিনী নিয়ে সাহেবরা এল বাড়ি সার্চ করতে।

কলকাতা থেকে পুলিশ দফতর যে তার পাঠিয়েছিল, তা ছিল সাংকেতিক ভাষায় লেখা। তার পাঠ উদ্ধার করতে পারল না মেদিনীপুরের পুলিশকর্তারা। তারা ছুটে এলো কলকাতায় মানে বুঝতে।

এদিকে বিপ্লবীরাও বসে ছিলেন না। তাঁরাও খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথের কাছে। খবর পেয়েই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিপ্লবী কেন্দ্রের সব গোপন কাগজপত্র সরিয়ে ফেললেন।

একযোগে পুলিশ সেদিন মেদিনীপুরের বহু বাড়িতেই খানাতল্লাশী করল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাড়িতে পাওয়া গেল একটা বন্দুক, কুকরী, বাঁশের লাঠি, কবিতার বই, অন্য আরো কিছু বই, চিঠিপত্র যা একান্তই পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে লেখা।

অন্য এক বিপ্লবী যোগজীবনবাবুর বাড়িও সেদিন খানাতল্লাশী হয়েছিল। তিনি খানাতল্লাশী চলার মধ্যেই ছুটে এসেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাড়িতে। কারণ তিনি জানতেন সেখানে হানা দিলে পুলিশ অনেক গোপন খবর পাবে। বোমাও পাবে। তিনি এসে দেখলেন পুলিশ একদম বোকা বনেছে। কিছুই পায়নি। কারণ বন্দুকটার সরকারি লাইসেন্স আছে।

তবুও পুলিশ জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ আর যোগজীবনকে গ্রেফতার করল। কোনো প্রমাণ না থাকাতে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে জামিনে ছেড়ে দিল। সত্যেন্দ্রনাথ আর যোগজীবনকে হাজতে পাঠাল। তাদের পুলিশ বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখত।

ছাড়া পেয়েই জ্ঞানেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর ছাড়লেন। তিনি গোপনে ফের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবার সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। পুলিশ তাঁর মেদিনীপুরে ঢোকা বেআইনি ঘোষণা করল।

পরে অবশ্য একটি শর্তে তারা সে হুকুম তুলে নিয়েছিল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবেন না। এমনই চলেছিল বহুদিন। বিপ্লবীদের আন্দোলন কমলে, তাঁকে আবার স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বিপ্লবী আন্দোলনে শহিদ হননি। তাঁর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বসু শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ। তিনি নিজে এমনভাবে থাকতেন যাতে তাঁকে পুলিশ কখনও সন্দেহ করতে না পারে। তিনিই গোপনে বিপ্লবীদের তৈরি করতেন। তাঁরই হাতে গড়া বহু বিপ্লবী শহিদ হয়েছেন।

বহুদিন পরে এ্যানি বেশান্ত ভারতের জন্য হোমরুল আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সে আন্দোলন ছিল অহিংস আন্দোলন। বিপ্লবী চিন্তাধারার সঙ্গে তার কোনও যোগ ছিল না। সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

শেষ জীবনে আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। শরীরও তাঁর ভেঙে পড়েছিল। প্রচণ্ড হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন তিনি। সেই যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

নীরবে সবার চোখের আড়ালে থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চিরজীবন বিপ্লবের জন্যই প্রাণপাত করেছেন। তাঁর আদর্শে প্রেরণায় শিক্ষায় অনেকেই হাসিমুখে শহিদ হয়েছেন। বিপ্লবী আন্দোলনে এত বড় সাংগঠনিক খুব কমই ছিলেন।

ছবি : সুফি

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জার্মান দস্যুরা তখনও পুরোপুরি যায়নি খামার থেকে। এত তাড়াতাড়ি যাওয়াও সম্ভব নয়। শস্যভাণ্ডারটা তো নিতে হবে সঙ্গে। নিয়ে যাওয়ার মতো পশু অবশ্য খামারেই আছে। ষাঁড়, মোষ শত শত আছে টারজানের। তাদের পিঠে পিঠে বস্তা বোঝাই করে নিতে হবে। সময় লাগবে তাতে। কিছু গত দুই দিনেই পাচার করেছে জার্মানেরা, কিছু সৈন্যও গিয়েছে তাদের খবরদারির জন্য। তারপরেও শস্য পড়ে রয়েছে পাহাড়প্রমাণ, সৈন্যও রয়েছে প্রায় একশোর মতো। তবে তারা কেউ জার্মান নয়, জার্মান-পদানত আস্কারি আফ্রিকান সৈনিক তারা। সে-সৈন্যেরা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সেই মুহূর্তে। কেউ গম ভরছে বস্তায়, কেউ ভরা বস্তা চাপিয়ে দিচ্ছে ভারবাহী পশুর পিঠে। পেশায় তারা সৈনিক। কিন্তু সৈনিকসুলভ শৃংখলাবোধ এখন তাদের মধ্যে তিলমাত্র নেই। থাকা যে দরকার, এটাও তারা অনুভব করছে না। ওয়াজিরি সৈনিকেরা নিঃশেষ হয়েছে চোরা-আক্রমণে। চরেরা খবর দিয়েছে যে এই খামার থেকে নিকটতম ওয়াজিরি সামরিক ঘাঁটির দূরত্ব অন্ততঃ একশো মাইল। আর সেই একশো মাইল পথও সিংহ আর চিতায় পূর্ণ নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন।

সুতরাং তারা কাজ করে যাচ্ছে এলোমেলো রকমে, আকস্মিক বিপদের আশংকা আদৌ নেই তাদের মাথায়।

অকস্মাৎ তাদের মধ্যে কেউ একজন বলে উঠল–"ভূঁইচাল! ভূঁইচাল! মাটি কাঁপছে রে!"

"ভূমিকম্প?"–কান খাড়া করে উঠল কালা-সার্জেন্ট ওয়াসাম্বু–"যারা দাঁড়িয়ে আছ, তারা বসে পড় সবাই।"

বসে তারা পড়ল ঠিকই। কিন্তু মোষ গরুগুলোকে যে আগলানো যাচ্ছে না! তারা ছুটে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে।

কি বোকা এই জানোয়ারগুলো! ভূমিকম্পের সময় কি দৌড়োনো যায়?

না, দৌড়োনো যায় না সত্যিই। দৌড়োবার চেষ্টা করেছে যে-সব দোপেয়ে আর চার-পেয়ে জীব, মুখ থুবড়ে ভূমিশয্যা তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে চোখের পলকেই। কিন্তু তফাৎ এই, মানুষ ঠেকে শেখে, জন্তুরা ঠেকেও শেখে না। মানুষরা তাই দৌড়োবার চেষ্টা করছে না আর, গরু মোষগুলো ক্রমাগত করে যাচ্ছে সে চেষ্টা। যে-মাটিতে পড়ে গরু, ওঠে সেখানেই।

ট্রিয়াং-ট্রিয়াং-ট্রি-ট্রি-ট্রিয়াং–

এত হাতী ডাকে কেন? এক সঙ্গে, আর ডাকগুলো যে নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে! ভূমিকম্পে হাতীও কি এমনিধারা চেঁচিয়ে থাকে না কি? আরে ও কি! হাতীর পাল যে এই খামারেই ঢুকেছে! শুঁড় দেখা যায় যে ওদের। এইদিক পানেই

যে ধেয়ে আসছে তারা ! চাপা দিয়ে চলে যাবে ! এই শ'খানেক আস্কারিকে পায়ের তলায় পিষে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে এক্ষুণি। পালাও আস্কারি ভাইয়েরা ! শুয়ে থাকলে মরণ অনিবার্য। ওঠো, দৌড়োও–ক্ষ্যাপা হাতীর দল এল বলে–

উঠছে আস্কারিরা, উঠছে, দৌড়োচ্ছে, পালাচ্ছে। কই, কেউ তো পড়ে যাচ্ছে না দৌড়োতে গিয়ে। ঈস্ ! একটু আগে যদি এই চেষ্টাটা করা যেতো ! দৌড়ে পালাবার চেষ্টাটা ! ভূমিকম্প না ছাই ! কোথায় ভূমিকম্প ? একশো দুইশো পাহাড় যদি ছুটতে থাকে ঝড়ের বেগে, মাটি কাঁপবে না একটু ? এ যা হচ্ছে, তা হাতীকম্প, ভূমিকম্প নয়–

ধরাশয্যা ছেড়ে আস্কারিরা পালাচ্ছে এবার। দৌড়োলে যে প্রাণটা বাঁচতেও পারে, এ বোধ তাদের হয়েছে খুব দেরিতে। তাদের মধ্যে সাহসী যারা, এই প্রাণসংশয়ের মুহূর্তেও তারা দুই একবার পিছন পানে ফিরে তাকিয়েছিল বইকি ! কী দেখেছিল, তা তারা পরবর্তীকালে গল্পও করেছিল কেউ কেউ। কোনো দুইজন আস্কারির গল্প একরকম হয়নি। কেউ বলেছিল, তারা অরণ্যদানব বোংগাকে দেখেছে হাতীর পিঠে, কেউ বলেছিল, বোংগা-টোংগা নয়, যাকে দেখেছিলাম, তার চেহারা বোংগার মেটে বা পাথুরে মূর্তি, যা আমরা অহরহ দেখতে পাই গাঁয়ে ঘরে গাছতলায় নদীর ঘাটে তার সংগে একেবারেই কোনো মিল নেই। প্রথমেই ধর, বোংগার রং চোখ জ্বড়ানো কালো, এর রং বিশ্রী সাদা। বোংগার পরনে থাকে নানা রংয়ের বাহারী পোশাক, এ-মূর্তিটার কোমরে শুধু একফালি চামড়া জড়ানো। সবচেয়ে বড় কথা, বোংগার হাতে থাকে এক চাঙড় পাথর, আর এ-মূর্তি একটা খাটো মোটা বল্লম উঁচু করে নাচাচ্ছিল হাতীর পিঠে দাঁড়িয়ে।"

"না, বোংগা এ নয়। বরং গ্রেস্টোকের চেহারা আর পোশাকের যে বর্ণনা আমরা শুনেছি, তাতে তো বরং ওকে সেই গ্রেস্টোক বলেই মনে হয়েছিল আমাদের। কিন্তু তাও জোর করে বলতে পারব না কেউ। গ্রেস্টোকের সম্বন্ধে নানা গপ্পোই চাউর আছে বটে দেশে বিদেশে, কিন্তু কেউ তো এ-যাবৎ আমাদের বলেনি যে বনের দু'শো পাঁচশো ক্ষ্যাপা হাতী একত্র করে সে হামলা চালাতে পারে দোপেয়ে দুশমনের উপরে !"

আস্কারিদের শ'খানিক সৈনিক গ্রেস্টোকের খামারে এসেছিল জার্মান প্রভুদের ধ্বংসলীলায় সাহায্য করার জন্য। তারাই পিছনে রয়ে গিয়েছিল, গোলার সঞ্চিত শস্য জার্মান অধিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন টারজানের কোপে মরল তারাই, দুই চারজন বাদে।

তারা চাপা পড়ল হাতীদের পায়ের তলায়। গোটা গজবাহিনীটা টর্নাডোর বেগে ধেয়ে চলে গেল তাদের ভূপতিত দেহের উপর দিয়ে। যে দুই চারজন বাঁচলো, তারা বাঁচলো শুধু টারজানের দয়াতেই। দয়া অবশ্য এক্ষেত্রে হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতাপ্রসূত নয়। নিজের গরজেই টারজান এদের কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কী কারণে এই আকস্মিক অহেতুক আক্রমণ, সে-আক্রমণের পরেও টারজানের আপনজনেরা বা ওয়াজিরিরা কেউ বেঁচে আছে কিনা, থাকলে তারা কোথায় আছে কী অবস্থায়, এই সব তথ্য যথাসম্ভব ঐ আস্কারিদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যাবে, এই আশাই করেছিল টারজান।

সে-আশা কিন্তু পূর্ণ হলো না। আক্রমণের হেতু যে কী, তা অজ্ঞ বর্বর আস্কারিরা জানবে কোথা থেকে ? কেউ বেঁচে আছে কিনা ? আস্কারিরা লড়াই করেছিল, মাঠে জংগলে কর্মরত ওয়াজিরি শ্রমিক ও সৈনিকদের সংগে। সেইরকমই আদেশ ছিল জার্মান সেনানীদের। তা সেই শ্রমিক বা সৈনিক খুব সম্ভবত বেঁচে নেই কেউ। কী করে থাকবে ? তারা যখন ভোরবেলা মাঠে জংগলে কাজ করবার জন্য বেরিয়েছিল, তখন অস্ত্র হাতে করে বেরোয়নি। যেসব হাতিয়ার তাদের হাতে ছিল, তা হলো কোদাল, কুড়ুল, লাঙল, শাবল প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আস্কারিরা সজ্জিত ছিল রাইফেলে তরোয়ালে বোমায় গ্রেনেডে। তেমন অসমযুদ্ধে ওয়াজিরিদের রক্ষা পাওয়ার আশা কোথায় ?

টারজানের আত্মীয়জনেরা ? তারা তো ছিল ঐ বাংলো বাড়িটাতে। আধপোড়া হয়েও যেটা এখনও খাড়া আছে। খাড়া আছে শুধু এই কারণে যে ও-বাড়িটা আংশিক পাথরে তৈরি। কাঠের কাঠামো পুড়ে ছাই হয়েছে, পাথুরে অংশটা হয়তো নষ্ট হয়নি। ওখানে যা কিছু করবার, গোরা সৈনিকরাই করেছে। কাপ্তেন **মুয়েরবার্ন** নিজে ওখানকার সৈন্য চালনা করেছিলেন। তিনি খামার ছেড়ে চলে যাবার পরেও আস্কারিরা ও বাড়িতে ঢোকেনি। কী করতে ঢুকবে ? লুঠ করার যা কিছু ওখানে ছিল, তা তো জার্মানরাই লুঠে নিয়ে গিয়েছে।

টারজান এইটুকু শুনেই ছুটে গিয়ে ঢুকলো বাংলোতে, তার অতিপ্রিয় সুখের নীড়ে। কী দেখল সেখানে ?

ঘরে ঘরে নিহত ওয়াজিরিদের ছিন্ন খণ্ডিত শবদেহ। রক্ত এখনও জমাট বেঁধে আছে যত্র-তত্র। পরিচিত প্রিয় ভৃত্যেরা মরে পড়ে আছে প্রতি দ্বারপথে। যুদ্ধ করেই মরেছে তারা। হাতে রক্তমাখা অস্ত্র তাদের প্রত্যেকেরই। নিরস্ত্র দুই একজনকে ফাঁসী দিয়েও মেরেছে দুশমন।

জেন ? লেডি জেন ?

জেন-এর শয়নকক্ষে একটি পোড়া দেহ পড়ে আছে। এমনভাবে সেটি পুড়েছে যে কিছুমাত্র বুঝবার জো নেই যে দেহটা কার। তবে গায়ে গয়না আছে। সে গয়না যে জেন-এরই, তা চিনতে কষ্ট হলো না টারজানের। সুতরাং এ দেহ জেন ছাড়া অন্য কার হবে ?

জ্বলে যায় ! পুরুষসিংহ টারজানের বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় বুঝি। জ্বলে যায় শোকে, দুঃখে, নৈরাশ্যে, বিফল জিঘাংসায়।

সেই মুহূর্তে টারজান এক কঠিন শপথ গ্রহণ করল–এই অহেতুক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক কাপ্তেন **মুয়েরবার্নকে**

সে জ্যান্ত নিক্ষেপ করবে ক্ষুধিত সিংহের গ্রাসে।

হস্তীযূথকে বিদায় দিয়ে আবার সেই আরণ্যশূন্যপথে মহাবনানী অতিক্রম করল টারজান। বনসীমা প্রায় যখন হাতের কাছে, তখন কিন্তু সে আর সমতল অঞ্চলের দিকে গেল না। ঈষৎ উত্তরে বেঁকে ধাবিত হলো কিলিমাঞ্জারো গিরিমালার দিকে। সমতলে আত্মগোপন করা যে-কোনো লোকের পক্ষে শক্ত। তায় টারজান আবার আকারে-আচরণে সমগ্র মানবজাতি থেকে আলাদা রকমের। সিংহচর্মের একফালি কৌপীন ছাড়া পরিচ্ছদ বলতে কিছু নেই যার পরিস্ফীত পেশল দেহে, অস্ত্র বলতে যার কাঁধে আছে তীরধনু আর বল্লমের সঙ্গে মাত্র একগাছা সুদীর্ঘ ঘাসের দড়ি, তাকে তো গোটা আফ্রিকা মহাদেশের যে-কোনো অধিবাসী এক-নজরেই চিনে ফেলবে মহাকপিলালিত টারজান বলে।

এ-দেশটা জার্মানশাসিত। বর্তমানের এই যুদ্ধের আবহাওয়ায় টারজান এখানে অবাঞ্ছিত। অপরাধ? তার একমাত্র অপরাধ এই যে শিরায় সে ইংরেজরক্ত বহন করে। একমাত্র সেই অপরাধেই, যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানসেনা হানা দিয়েছে তার জমিদারিতে, হাজার মাইল বিস্তীর্ণ অরণ্য অতিক্রম করে। টারজানের সংগৃহীত স্বর্ণ ভাণ্ডার তারা লুটে নিয়ে গিয়েছে, টারজানের বাইশটা তেতলা গোলা খালি করে লক্ষ পাউন্ড দামের খাদ্যশস্য তারা পাচার করে দিয়েছে জার্মান এলাকায়, আর সবচেয়ে যা ভয়াবহ, ঘৃণ্যতম ব্যাপার, ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে শুধু টারজানের ওয়াজিরি সৈন্যগুলিকেই নয়, টারজানের সহধর্মিণী লেডী জেনকেও। এ-অপরাধের সাজা অবশ্যই দেবে টারজান। একবার শপথ গ্রহণ করেই টারজান সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, বারবার দিনের বেলা শূন্যপথ পরিক্রমা করার কালে, রাত্রিবেলা নভঃস্পর্শী কোনো মহাবনস্পতির সুপরিসর তেডালায় পর্ণশয্যায় বীরবপু এলিয়ে দিয়েও স্বপ্নঘোরে সে নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে শত শতবার– "ক্ষুধিত সিংহের গ্রাসে আমি ছুঁড়ে ফেলব সেই মুয়েরবার্ণককে, কেউ তাকে পারবে না রক্ষা করতে। পারবে না, পারবে না, কদাচ পারবে না।"

কিলিমাঞ্জারো পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশ্রেণীর মধ্যে একটি। তবে তার সকল অংশ সমান দুরারোহ নয়। অনেক স্থানেই একসারি অনুচ্চ পাহাড় তাকে প্রাকারের মতো ঘিরে আছে। প্রাকারও বলা যায়, বলা যায় পাদপীঠও। ছোট ছোট পাহাড়, মাঝে মাঝে গভীর সংকীর্ণ উপত্যকা, কোথাও সুনিবিড় অরণ্য, কোথাও আবার শ্যামসুন্দর সমতল তৃণভূমিও আছে এই পাদগিরিগুলির আবেষ্টনীতে। অনায়াসে এখানে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠতে পারত, জনগণের বা গভর্নমেন্টের সেদিকে উদ্যম থাকলে।

কিন্তু কোথায় সে উদ্যম? সরকারের বিবেচনায় এটা স্রেফ একটা কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত উপনিবেশ মাত্র, যেখান থেকে ইউরোপে বসে তাঁরা শস্য, খনিজ বস্তু, আরণ্য সম্পদ প্রভৃতি নিজেদের দেশে আমদানি করতে পারেন এবং যুদ্ধবিগ্রহের কালে সৈন্যবল সংগ্রহ করতে পারেন আস্কারি ব্যাটালিয়ন গঠন করে। কিলিমাঞ্জারো অঞ্চলের উন্নয়ন, বা সে-অঞ্চলের কালাআদমিদের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির কথা তাঁদের চিন্তার জগতে স্থান পায়নি ইতিপূর্বে কোনোদিন। আর এখন? বর্তমানের এই যুদ্ধের পরিবেশ তো সে ভাবনাচিন্তার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়।

কৌতূহলী মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে একটা। না-করলেন জার্মান সরকার এ-অঞ্চলের উন্নয়নের কোনো উদ্যম, এ-দেশের অধিবাসীরা তো অনায়াসেই তা করতে পারত। তার জন্য প্রভূত অর্থবলেরও আবশ্যক ছিল না, ছিল না অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত জনবলেরও। এ-প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়। এ-অঞ্চলকে অবহেলিত, অনাদৃত পড়ে থাকতে দিয়েছে এ-দেশের আদিবাসীরা। একটিমাত্র কারণে। সে কারণ হলো সিংহের ভয়। কিলিমাঞ্জারোর পাদপর্বতশ্রেণী ওদিক দিয়ে অতিমাত্র কুখ্যাত। আফ্রিকার সমস্ত প্রদেশেই আছে সিংহ, কোনো কোনো প্রদেশে খুব বেশি সংখ্যাতেই রয়েছে। কিন্তু এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এই কিলিমাঞ্জারোর পাদগিরিতে সিংহের যা সংখ্যা, তার অর্ধেকও নেই এই মহাদেশের অন্য কোনো অংশে।

শুধু সংখ্যার দিক দিয়েই নয়, চারিত্রিক নিষ্ঠুরতায়, দৈহিক শক্তিতে এবং নররক্ত নরমাংসের উপরে অদম্য লোভে কিলিমাঞ্জারোর সিংহেরা আফ্রিকার অন্য সব দেশের সিংহকে বহু পশ্চাতে ফেলে এসেছে বহুদিন আগে। এইসব কারণে সিংহ ভীতিটা আবহমানকাল থেকে আস্কারিদের মজ্জাগত। সিংহদেরও যে মেরে মেরে কমিয়ে দেওয়া যায়, এ-বিশ্বাসই কোনোদিন জন্মাতে পারেনি এ-অঞ্চলের লোকের মনে। তারা জানে যে সিংহের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক হলো এই যে মানুষে-সিংহতে চোখোচোখি হলে, তার একটিই মাত্র পরিণতি, সে-মানুষটা উদরস্থ হবে সে-সিংহের। সুতরাং–

কিলিমাঞ্জারোর পাদগিরিমালা চিরদিন অপরিচিত রয়ে গিয়েছে আস্কারি জনগণের।

আবার একটা প্রশ্ন উঠছে। জনসমাগমই যদি না থাকে ঐ পাদগিরি অঞ্চলে, টারজান সেখানে যায় কী করতে? শৌখিন পর্যটনে তো সে বেরোয়নি এবার!

না, তা সে বেরোয়নি। তার এবারের অভিযান শুরু হয়েছে একটা অতি সাংঘাতিক সংকল্প নিয়ে। কাস্তেন মুয়ের-বার্ণককে সিংহ দিয়ে খাওয়াবে সে, এই তার পণ।

[চলবে]

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

ভালো আছো জানি কিন্তু মন নিশ্চয়ই খারাপ। দুর্গাপুজো হয়ে গেলো, কালীপুজো হয়ে গেলো, ভাইফোঁটাও হয়ে গেছে—এখন মন-টন তো একটু খারাপ হবেই। পুজোর জন্যে, পুজো সংখ্যার জন্যে আবার তো সেই এক বছরের অপেক্ষা। কথায় বলে না, সবুরে মেওয়া ফলে। এও তাই। এক বছরের প্রতীক্ষার পর পুজো আসে বলেই তো পুজোর এতো মজা, এতো আনন্দ।

ওদিকে উত্তরে হাওয়া জানান দিচ্ছে শীত আসছে। গাঁদা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিফুটি করছে। মাঠ থেকে ক্রিকেট ব্যাট-বলের শব্দ ভেসে আসছে। যে সময় যা, তাই না? দেখছো তো প্রকৃতি নিজের সংসার কি সুন্দরভাবে নিয়মশৃঙ্খলার জালে বেঁধে রেখেছে। সত্যি, প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা কতো কীই না শিখতে পারি।

থাক ও সব কথা। আচ্ছা, তোমরা তো এখন নিশ্চয়ই টি. ভি. দেখো। যারা নিয়মিত দেখতে পাও না তারাও নিশ্চয়ই খেলা-টেলা থাকলে টি. ভি-র সামনে গিয়ে বসে পড়ো। এখন বলো দেখি প্রথম কবে টি. ভি-তে ছবি দেখা গিয়েছিলো? টি. ভি-র প্রথম অনুষ্ঠানের শিল্পীই বা কে? যারা এ প্রশ্নের উত্তর জানো তারা অন্যকে জিজ্ঞেস করে বোকা বানিয়ে দিতে পারো। যারা জানো না, তারা এবার জেনে নাও। দূরদর্শনে প্রথম সরাসরি ছবি দেখা গিয়েছিলো ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে। ইংলন্ডের রাজধানী লন্ডন শহরে নিজের পরীক্ষাগারে ঐ ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন টি. ভি-র অন্যতম আবিষ্কারক জন লোগি বেয়ার্ড। টি. ভি-র প্রথম অনুষ্ঠান দেখার জন্যে একদল দর্শককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। তাঁরা অবাক হয়ে বিশ্বের প্রথম টি. ভি অনুষ্ঠান দেখলেন। অবশ্য টি. ভি-র পর্দায় ছবি সেদিন খুব কাঁপছিলো, খুব একটা পরিষ্কারও ছিলো না। কিন্তু সেসব নিয়ে সেদিন কেউ মাথা ঘামাননি। বেয়ার্ড সাহেব যেমন খুশি হয়েছিলেন তেমনি আনন্দে আটখানা হয়ে পড়েছিলেন দর্শকরা। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলো একটি কথা-বলা পুতুল।

বেয়ার্ড অবশ্য ঐ ঘটনার এক বছর আগেই, ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে একজন মানুষকে দিয়ে টি. ভির অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। তাঁর অফিসের একটি বেয়ারা ছিলো টি. ভি-তে বিশ্বের প্রথম মানুষ শিল্পী।

তবে টি. ভি-র আবিষ্কারক হিসেবে শুধু বেয়ার্ডের নাম বললেই চলবে না। মার্কিন বিজ্ঞানী চার্লস ফ্রান্সিস জেনকিন্সও ঐ সময় টি. ভিতে ছবি দেখাতে পেরেছিলেন। তবে দর্শকদের সামনে নয়—এই যা। বেয়ার্ডই বাজিমাৎ করেছিলেন। ১৯২৮ সালে বেয়ার্ড টি. ভিতে রঙিন ছবি দেখিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে বেয়ার্ড তাঁর স্টুডিও থেকে বি. বি. সি-র একটি নাটকও টি. ভিতে দেখিয়েছিলেন। সব দিক দিয়ে চিন্তা করলে বেয়ার্ডই আসল কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, তাই না!

সে যাই হোক—এবার তোমাদের কয়েকজনের চিঠির কথা বলি। **দীপ্তেন্দুবিকাশ ষন্নিগ্রাহী** (কংসাবতী কলোনী, কেন্দুয়াডিহি, কোয়ার্টার নং সি-৮, বাঁকুড়া)। পুজোসংখ্যা তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। ভাঙাবাড়ির রহস্য উপন্যাসটি তোমার খুব ভালো লাগার কথা লেখককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। **সমীর সরকার** (বেথুয়াডিহি, নদীয়া) লিখছে পুজো সংখ্যায় ওর খুব ভালো লেগেছে লীলা মজুমদার, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল ভৌমিক, শিশিরকুমার মজুমদার আর আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প আর অমিয়কুমার হাটির নিবন্ধ। **গণেশচন্দ্র মণ্ডল** (C/o তৃষ্টুলাল মণ্ডল, গ্রাম মিলনগর, পোঃ বগুলা, জেলা-নদীয়া)। গণেশ, তুমি তো ভাই অনেক লেখা পাঠাচ্ছো, কিন্তু একটাতেও তোমার বয়েস, ক্লাশ কিংবা স্কুলের নাম থাকে না। ওসব না থাকলে যে লেখা ভালো হলেও ছাপা হবে না। আর লেখা সব সময় ছোট করবে। **নীলাঞ্জন দাস** (C/o নিমাইচন্দ্র দাস, মালদা, ১৬/বি, বেন্টাল হাউজিং স্টীট, মহেশমাটি, মালদা)। সত্যজিৎ রায়ের লেখা তো আর পাওয়া যাবে না। অন্য যাঁদের লেখা চেয়েছো তাঁদের লেখা তো ছাপা হয়ই।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

শোভলাল দপ্তরী,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী, শক্তিনগর উচ্চবিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর

পরিচয়

ইলেভেন পড়ি আমি
সঞ্জয় আমার নাম,
বাঁকুড়া জেলার রাম সাগরে
আমার হলো ধাম।
আমার বাবা মাস্টারমশাই
ছাত্র পড়ান নিত্য,
মা আমার হাসি খুশি
সদাই কাজে ব্যস্ত।
দাদু আমার বুড়ো মানুষ
গীতা পড়েন রাতে,
ঠাক্‌মা আমার সদাই শুয়ে
ভোগেন কেবল বাতে।
ছোট্ট আমার পরিবার
দিলাম পরিচয়,
এখন আমি ক্লান্ত বড়ো
পদ্য লেখা দায়।

সঞ্জয় সেন, বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সঞ্জয় সাহা, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, নেতাজী বিদ্যামন্দির,
ঢেকিয়াজুলি

পাখির রাজা

আমরা ঘুম থেকে উঠলে কত পাখির ডাক শুনতে পাই। তাদের ডাক কত সুন্দর। বাগানের বড় বড় গাছে কত পাখি না দেখতে পাই। বলতে পার পাখিরা কেন উড়ে বেড়ায়? পারলে না তো। তাহলে শোন বলি–

হাজার হাজার বছর আগের কথা, তখন সব পাখি এক সংগে বাস করত। একই জায়গায়। সেটা ছিল পাখিদেরই রাজ্য। তাদের ডাকে পাখির রাজার মাথা ব্যথা করত। কিন্তু রাজা কাউকে কিছু বলতে পারত না। বলবে কি করে! সে নিজেই যে পাখিদের রাজা।

একদিন পাখির রাজা মতলব করে বলল, আমার একটা কথা জানবার খুব ইচ্ছে হয়। ময়না পাখি প্রণাম করে বলল, মহারাজ আপনি কি কথা জানতে চান? রাজা বলল, পৃথিবী কেন গোল, আর কেন ওপর নিচ চ্যাপ্টা?

এই কথা শুনে সব পাখিরা বলল, এটা আমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব। আর প্রতিজ্ঞা করছি যতদিন না এর উত্তর পাব ততদিন দেশে ফিরব না।

রাজাকে কথা দিয়ে পাখিরা চারভাগ হয়ে চারদিকে উড়ে গেল। প্রথমে একটা পাখি খরগোশকে জিজ্ঞেস করলে, ও খরগোশদাদা, বলতে পার পৃথিবী কেন গোল?

খরগোশ বলতে পারল না। এমনি করে পাখিরা পশু ছাড়াও মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। তাই পাখিদেরও আর দেশে ফেরা হয়নি। এদিকে তাদের সমবেত ডাক না শুনতে পেয়ে পাখির রাজার মাথাব্যথাও সেরে গেল।

সেই থেকে পাখিরা আজও উড়ে বেড়ায় আর সবাইকে ওই প্রশ্ন করে। এবার জানলে তো তাদের উড়ে বেড়াবার কারণ।

সমীর বিশ্বাস, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বিদ্যাসাগর প্রাইমারী স্কুল, দুর্গাপুর

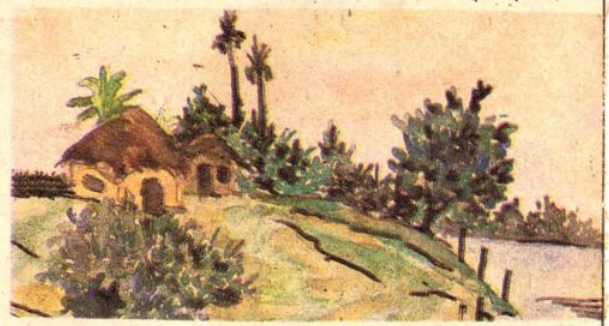

সৌরভ রায়, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী,
অদ্রা বয়েজ প্রাইমারী স্কুল, পুরুলিয়া

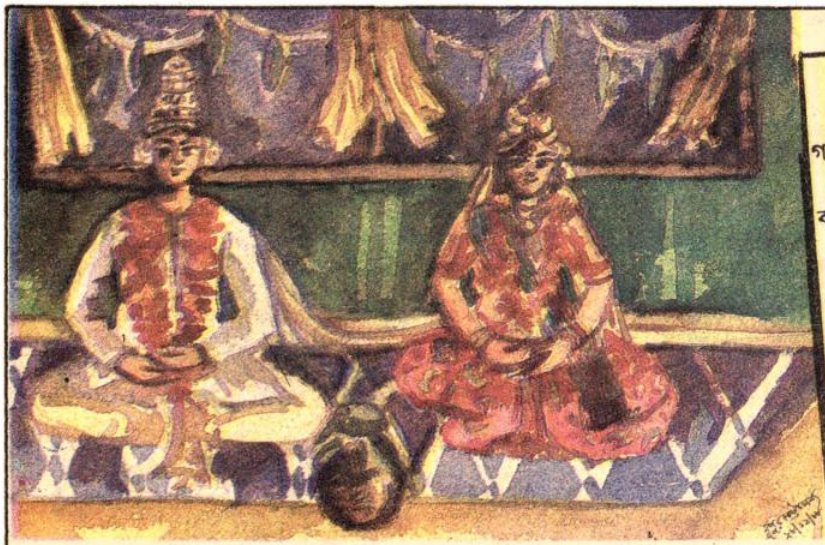

নূপুর ভট্টাচার্য, বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী, পাঠভবন, কলকাতা

গাছ কেটো না

গাছ কেটো না গাছ কেটো না
গাছই মোদের প্রাণ
বরং গাছ লাগিয়ে করো
নতুন জীবন দান।

গাছও হলো মোদের মতো
একটি তাজা প্রাণ।
গাছ থাকলে শুনব সবাই
পাখির কলতান
এসো সবাই মিলে করি
সবুজের জয়গান।

জয়িতা ব্যানার্জী, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা-৫৫

কলির শেষ

সোনার ভারত জ্বলছে আজি,
মরছে মানুষ, ফাটছে বাজী।
নেতায়-নেতায় চলছে লড়াই,
নিজের বড়াই করছে সবাই।
চুরি-চাপাটি চলছে বেশ,
খুনো-খুনির নেইকো শেষ।
ভূ-স্বর্গের সেনার রবির
রক্তে রাঙা মলিন ছবি,
অত্যাচার আর অনাচার,
ভুলবে কি আর ভারত আমার?
রাঙা মাটির রাঙা ছবি
কেমন হবে বল তো কবি?

কাগজে আর লোকের মুখে
ঘোরে ফেরে ভোটের নাম—
দুষ্কৃতিরা নাচে সব
পাড়ার লোকের বন্ধ দম।
গদির মানুষ নিশ্চিন্ত
টাকা-কড়ির নেই অন্ত।
হচ্ছে আগুন চালের দাম,
শ্রমিক ভায়ার ছুটছে ঘাম।
গোলাবোমা চলছে বেশ—
মরছে মানুষ জ্বলছে দেশ।
এই কি তবে কলির শেষ?

নন্দিনী কোনার, দ্বাদশ শ্রেণী
এস. এস. এল. এন. টি. কলেজ
ধানবাদ (বিহার)

বনের পাখি

বনের পাখি গাছের 'পরে
থাকতো নিজের সোনার ঘরে।
ডানা মেলে উড়তো দূরে
গান গাইত মধুর সুরে।
ছোড়দা তাকে খাঁচায় ভরে
নিয়ে এল নিজের ঘরে।
খাবার দিল ভর্তি বাটি
জলের পাত্র পরিপাটি।
খাঁচার পাখি দুঃখে কাঁদে
গায় না গান আর সকাল সাঁঝে।
বনের যত মুক্ত পাখি
বুঝবে কি তার দুঃখটা কি?

অনির্বাণ পাল, বয়স বারো,
ষষ্ঠ শ্রেণী, হালিশহর রামপ্রসাদ
বিদ্যাপীঠ, ২৪ পরগনা

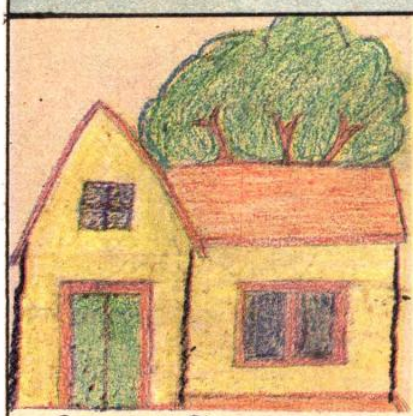

অজিতা চক্রবর্তী, বয়স ছয়
দ্বিতীয় শ্রেণী, শিশু শিক্ষায়ণ, শ্রীরামপুর

অনির্বাণ বাগচী, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বাঁকুড়া জেলা স্কুল, বাঁকুড়া

বাহাদুর বেড়াল

এই মরেচে! লাইব্রেরী বন্ধ আর এদিকে আমার বই ফেরত দেবার তারিখ পেরিয়ে গেছে!
লাইব্রেরী
অর্দ্ধ দিবস বন্ধ
জানালাটা খোলা যেতে পারে। যদি ভিতরে ঢুকতে পারি তবে বইটা ফেরত দিয়ে দেবো।
বাঁচাও! আমার মাথা আটকে গেছে দমকলে খবর পাঠাও।
আমি যেভাবেই হোক বইটা ফেরত দেবো। আমি এই নলটা বেয়ে ছাদে উঠে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবো।
বাঁচাও! দমকলে খবর পাঠাও! আমি আবার আটকে গেছি!

আবার তুমি! তোমার এসব করার কারণটা কি?
আ-আমার লাইব্রেরীর বই জমা দেওয়ার দিন পেরিয়ে গেছে। আর আমি ওটা লাইব্রেরীতে জমা দেবার চেষ্টা করছি
তুমি এই চিঠি ফেলার বাক্স দিয়ে চেষ্টা করোনি কেন?
লাইব্রেরী
অর্দ্ধ দিবস
বন্ধ
ইঃ! আমার প্রেস্টিজ ফ্যাকচার হয়ে গেলো!

দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিকেট খেলা দারুণ জনপ্রিয়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সব কিছু ঠিকঠাক চললে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলার কথা। বাইশ বছর আগে বর্ণবৈষম্য নীতির জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিলো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অধিকার ছিলো না তাদের। কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে নামকরা খেলোয়াড়দের ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দেশে খেলিয়ে সারা বিশ্বে ঝড় তুলেছিলো দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলো, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যাদের এতোটুকুও সম্পর্ক আছে তাদের সঙ্গে খেলবে না। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এসে দাঁড়িয়েছিলো পাশে। তবু বিদ্রোহী খেলোয়াড়রা যেতেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। যাঁরা যেতেন তাঁরা হারাতেন দেশের পক্ষে টেস্ট খেলার অধিকার। সারা বিশ্বের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা ধীরে ধীরে তাদের বর্ণবৈষম্য নীতি থেকে সরে আসতে শুরু করে। নেলসন ম্যান্ডেলাকে জেল থেকে মুক্তি দেবার পরই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফিরিয়ে আনা হয় আন্তর্জাতিক জগতে। ঠিক এক বছর আগে ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে একুশ বছর সাসপেন্ড থাকার পর দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে এসে তাদের প্রথম ম্যাচটি খেলেছিলো কলকাতায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের সেই প্রথম খেলা। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা খেললো বিশ্বকাপে আর বিশ্বকাপের পরই তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে টেস্ট খেলে এলো।

সাসপেন্ড হবার আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা শুধু ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেই খেলেছে। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট খেলছে ১৮৮৯-৮৯ সাল থেকে, কিন্তু কোনোদিনই তারা অশ্বেতকায় দলের সঙ্গে খেলেনি। বর্ণবৈষম্য নীতির জন্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যেমন তারা খেলেনি তেমনি এই দেশগুলোও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলার উৎসাহ বোধ করেনি। কিন্তু সাসপেন্ড থাকার সময় তারা অশ্বেতকায় খেলোয়াড়দের সাদরে ডেকে নিয়ে যেতো নিজেদের দেশে। গ্যারি সোবার্সকে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলো দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাই নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিলো সারা বিশ্বে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মানুষরা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তাঁরা গ্যারি সোবার্সের মতো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে সোবার্সকে পার পেতে হয়েছিলো। কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও মর্যাদা হারিয়েছিলেন সোবার্স। পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর এক অধিনায়ক আলভিন কালীচরণ দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে খেলার জন্যে শুধু দল থেকেই বিতাড়িত হয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর পক্ষে দেশে থাকাও সম্ভব হয়নি। বেশিরভাগ সময় তাঁকে কাটাতে হতো দক্ষিণ আফ্রিকায়।

গত বছর থেকে সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একুশ বছর পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে এসে দক্ষিণ আফ্রিকা এবার সব দেশের সঙ্গেই খেলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে

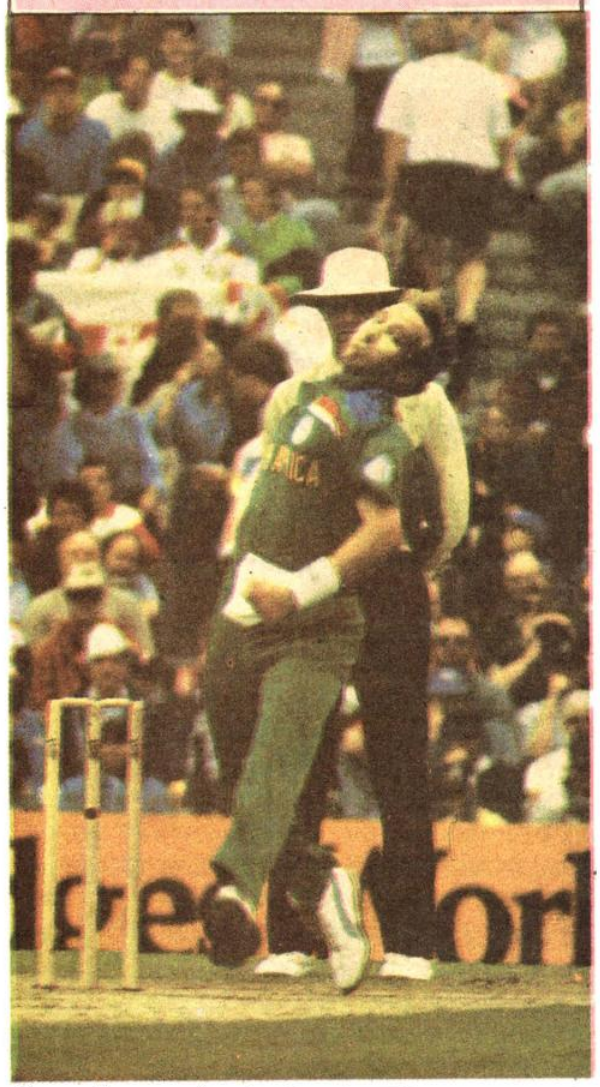

দক্ষিণ আফ্রিকার ফাস্টবোলার ম্যাকডোনাল্ড।

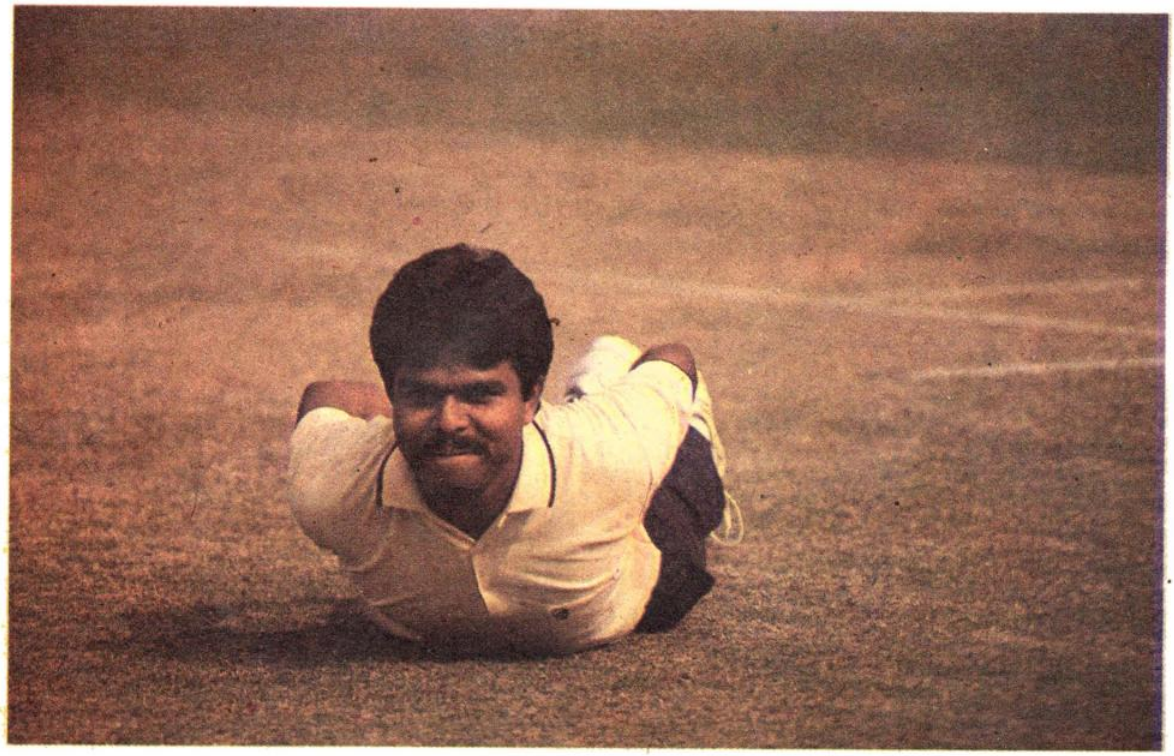

প্রবীন আমরে।

গিয়ে খেলে এসেছে তারা। এবার ভারত যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট খেলতে। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে টেস্ট খেলবে, একদিনের ক্রিকেট খেলবে। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট লড়াই শুরু হবে এই মাসেই। তার আগে আমরা বরং একবার দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ইতিহাসের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই।

টেস্ট ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার আবির্ভাব একটু অন্যরকমভাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ছিলো বৃটেনের কলোনী। ইংলন্ডই শাসন করতো সেই দেশ। যে দেশে ইংরেজরা গেছে তাদের হাত ধরে ক্রিকেট খেলাও সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। যেভাবে ভারতে ক্রিকেট খেলা এসেছিলো ঠিক সেইরকমভাবেই ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছেছিলো। এবং স্বাভাবিকভাবে সে দেশের মানুষ ধীরে ধীরে ক্রিকেট খেলায় উৎসাহী হয়ে পড়েছিলো। তবে গোড়ার দিকে সাহেবরাই শুধু ক্রিকেট খেলতেন।

মেজর গার্ডনার ওয়ার্টন দক্ষিণ আফ্রিকায় চাকরি করতেন। ১৮৮৮ সালে তিনি অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যান। ক্রিকেট খেলা তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। নিজেও একটু আধটু খেলতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিকেট খেলার প্রসারের জন্যে তাঁর অবদান ছিলো যথেষ্ট। দেশে ফেরার পরই তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। তিনি ঠিক করলেন ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের নিয়ে একটা দল গড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবেন। তিনি ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বললেন। সকলেই এক কথায় রাজী। মেজর ওয়ার্টন দলে পেলেন সেই সময়ের সাতজন নামকরা খেলোয়াড়কে। দলের অধিনায়ক হলেন সি. এ. স্মিথ। স্মিথ খুবই নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। পরে হলিউডের অভিনেতা হিসেবেও তিনি নাম করেছিলেন। স্যার উপাধিও পেয়েছিলেন। স্মিথের দল দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে মোট ১৬টি ম্যাচ খেলেছিলো। এর মধ্যে দুটি খেলা ছিলো দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। পরে এই দুটি খেলাকে টেস্ট ম্যাচের মর্যাদা দেওয়া হয়। আর এই দুটি খেলাতেই জিতেছিলো ইংলন্ড।

এই দুটি খেলার মধ্যে প্রথমটি হয়েছিলো পোর্ট এলিজাবেথে। দক্ষিণ আফ্রিকা আগে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮৪ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়েছিলো সি. এ. স্মিথ আর জে ব্রিগসের দুর্দান্ত বোলিং-এর জন্যে। স্মিথ ১৯ রানে ৫টি আর ব্রিগস ৩৯ রানে ৪টি উইকেট দখল করেছিলেন। এর জবাবে ইংলন্ড প্রথম ইনিংসে করলো ১৪৮ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার এ. রোজ ৪৩ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও দক্ষিণ আফ্রিকা সুবিধে করতে পারলো না। মাত্র ১২৯ রানে শেষ হলো তাদের দ্বিতীয় ইনিংস। এ. জে ফাদারগিল ১৯ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। জেতার জন্যে ইংলন্ডের তখন মাত্র ৬৭ রান দরকার ছিলো। ইংলন্ড মাত্র দুটি উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে নিয়ে জিতলো ৮ উইকেটে। দু দেশের মধ্যে দ্বিতীয় খেলাটি হলো কেপ টাউনে। এই খেলায় আগে ব্যাট করতে নেমে ইংলন্ড তাদের প্রথম ইনিংসে করলো ২৯২ রান। দু দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন

করলেন ইংলন্ডের আর. এবেল। তিনি করেছিলেন ১২০ রান। এইচ উড করেছিলেন ৫৯ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার ডব্রিউ এইচ. অ্যাসলি দারুণ বল করে ৯৫ রানের বিনিময়ে ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা দিলেন শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। ব্রিগসের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না কেউ। মাত্র ১৭ রান দিয়ে ব্রিগস পেলেন ৭টি উইকেট। ফলে মাত্র ৪৭ রানেই শেষ হয়ে গেলো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস। ফলো অন ইনিংসেও দক্ষিণ আফ্রিকার একই হাল হলো। আসলে ব্রিগস-ভীতি বিবশ করে দিয়েছিলো দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রিগস ৮টি উইকেট পেলেন মাত্র ১১ রানের বিনিময়ে। মাত্র ৪৩ রানে শেষ হয়ে গেলো দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস। ইংলন্ড জিতলো এক ইনিংস ও ২০২ রানে।

সেই ১৮৮৮-৮৯ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলন্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলে এসেছে। এই সময়ে দুটি দেশ ১০২টা টেস্ট খেলেছে। তার মধ্যে ইংলন্ড জিতেছে ৪৬টি টেস্টে, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮টিতে। বাকী ৩৮টি খেলার কোনো মীমাংসা হয়নি। ঐ ১০২টি টেস্টের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলা হয়েছিলো ৫৮টি টেস্ট ম্যাচ। তার মধ্যে ইংলন্ড ২৫টিতে জিতেছে, হেরেছে ১৩টিতে, বাকী ২০টি টেস্টের মীমাংসা হয়নি। ইংলন্ডের মাটিতে দু দেশ খেলেছে ৪৪টি টেস্ট। তার মধ্যে ২১টিতে ইংলন্ড জিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে ৫টি টেস্টে। বাকী ১৮টি খেলার মীমাংসা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট খেলছে ১৯০২-৩ সাল থেকে। সাসপেন্ড হবার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষবার টেস্ট খেলেছিলো অস্ট্রেলিয়ারই বিরুদ্ধে ১৯৬৯-৭০ সালে। অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা এ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ৫৩টি টেস্ট খেলেছে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ২৯টিতে আর দক্ষিণ আফ্রিকা ১১টি টেস্টে জিতেছে। বাকী ১৩টি টেস্টের কোনো মীমাংসা হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে দু দেশের মধ্যে ৩০টি টেস্ট ম্যাচ হয়েছে। তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ১৫টি টেস্টে জিতেছে, হেরেছে ৭টিতে। বাকী ৮টি টেস্টের কোনো মীমাংসা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ২০টি টেস্ট খেলেছে। তার মধ্যে তারা জিতেছে ৪টিতে, হেরেছে ১২টি টেস্টে। বাকী খেলাগুলির মীমাংসা হয়নি। এ ছাড়া ইংলন্ডের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩টি টেস্ট খেলেছে। এর মধ্যে দুটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে। বাকী টেস্ট ড্র হয়।

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট খেলছে ১৯৩১-৩২ সাল থেকে। শেষবার খেলেছে ১৯৬৩-৬৪ সালে। নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৭টি টেস্ট ম্যাচ হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ৯টি টেস্টে জিতেছে, নিউজিল্যান্ড জিতেছে ২টি টেস্টে। বাকী ৬টি খেলা ড্র। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭টি টেস্ট খেলে ৩টিতে জিতেছে। বাকী চারটির মীমাংসা হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে নিউজিল্যান্ড ১০টি টেস্ট খেলেছে। নিউজিল্যান্ড জিতেছে ২টি টেস্টে, হেরেছে ৬টিতে, বাকী ২টি টেস্টের মীমাংসা হয়নি।

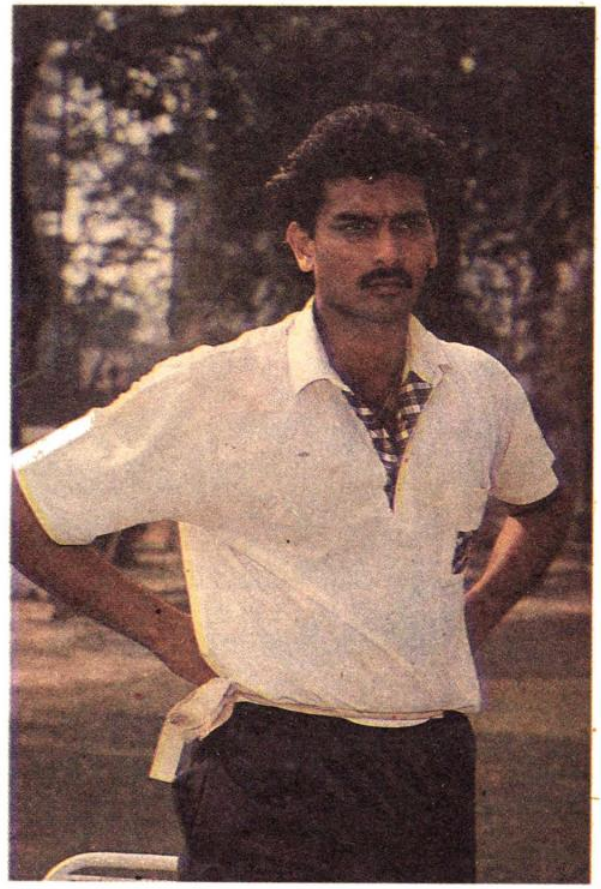

রবি শাস্ত্রী।

সাসপেন্ড হবার আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মোট ১৭২টি টেস্ট খেলেছিলো। তার মধ্যে তারা জিতেছিলো ৩৮টি টেস্টে, হেরেছে ৭৭টিতে। বাকী ৫৭টি টেস্টের কোনো মীমাংসা হয়নি। এ ছাড়া ১৯৫৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দল রোডেসিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলে এসেছিলো। ১৯৫৯-৬০ সালে ডেনিস কম্পটনের নেতৃত্বে একটি কমনওয়েল্থ দল দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলো। পরের বছরই রিচি বেনোর কমনওয়েলথ দল গিয়েছিলো দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯৬১-৬২ সালে ইভারটন উইকসের নেতৃত্বে একটি কমনওয়েলথ দল শুধু রোডোসিয়ায় খেলতে গিয়েছিলো। ১৯৬২-৬৩ সালে ওয়াটসন কমনওয়েলথ দল নিয়ে রোডেসিয়ায় আর সেই বছরই রিচি বেনো একটি কমনওয়েলথ দল নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলেন।

এ সবই দক্ষিণ আফ্রিকার সাসপেন্ড হবার আগের ঘটনা। ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা দীর্ঘ একুশ বছর পরে আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে এসেছে। এখনকার কথা আলাদা। আর সাসপেনশন প্রত্যাহারের পর ভারতই প্রথম সরকারী সফরে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছে। তাই ভারতীয় দলের এই সফরের গুরুত্ব অপরিসীম।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক কেপলার ওয়েসেলস।

গল্প নয় সত্যি

ঘটনাটা অনেকটা গল্পের মতোই।

১৯৩৯ সালের ৩ মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ইংলন্ডের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার টাইমলেস টেস্টের আসর বসেছিলো। ঠিক হয়েছিলো যতোক্ষণ না খেলার মীমাংসা হচ্ছে টেস্ট ম্যাচটি চলবে। তাতে খেলা শেষ হতে যতোদিন লাগে লাগুক। খেলাটি হয়েছিলো মার্চ মাসের ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৪ তারিখ পর্যন্ত। তবু কিন্তু খেলার মীমাংসা হয়নি। এই খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৩০ ও ৪৮১ রান করেছিলো। ইংলন্ড করেছিলো ৩১৬ ও ৫ উইকেটে ৬৫৪। ১১ মার্চ এমন বৃষ্টি হলো যে একদম খেলা হতেই পারেনি। বৃষ্টি অবশ্য ম্যাচটার শেষের দিকে পেছনে লেগেই ছিলো। মীমাংসার ব্যাপারটা আটকে গেলো বৃষ্টির জন্যে। ১৪ মার্চ বৃষ্টির জন্যে খেলা যখন বন্ধ হয়ে গেলো জয়ের লক্ষ্য থেকে ইংলন্ড তখন মাত্র ৪২ রান দূরে। পরের দিন একটুখানি খেলা হলেই ইংলন্ডের ব্যাটসম্যানরা সেই রান তুলে নিতে পারতেন। কিন্তু আর অপেক্ষা করা ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয় হয় তখন। বাতাসে বারুদের গন্ধ। আফ্রিকা কিছুটা নিরাপদ জায়গা হলেও ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের ইংলন্ডে নিয়ে যাবার জন্য জাহাজ এসে তখন কেপ টাউন বন্দরে অপেক্ষা করছে। ১৬ তারিখে জাহাজ ছেড়ে যাবে। সেই জাহাজ তাঁদের ধরতেই হবে। তাই নিজেদের মালপত্তর নিয়ে ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা সেদিন মাঠে এসেছিলেন। ডারবান থেকে কেপ টাউন যেতে প্রায় দুদিনের কাছাকাছি সময় লেগে যেতো। তাই ৪২ রান করলেই জেতা যাবে—এ কথাটা আর কেউ চিন্তা করলেন না। ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা সোজা মাঠ থেকে গিয়ে চড়ে বসলেন ট্রেনে। ১৬ তারিখে অ্যাথলোন ক্যাসেল জাহাজ ছাড়ার আগেই ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা গিয়ে পৌঁছুলেন বন্দরে। তারপর জাহাজে চড়ে সোজা লন্ডনে। টাইমলেস টেস্টটির চূড়ান্ত মীমাংসা হলো না বটে, কিন্তু দু দল মিলে টেস্ট ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রান তোলার নজির গড়ে ফেলেছিলো ইংলন্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার সেই টেস্ট ম্যাচটি। দু দল মিলে সেই টেস্টে ১৯৮১ রান তুলেছিলো।

তোমাদের জিজ্ঞাসা

রথীন্দ্রনাথ দে (শান্তিধাম, জি. টি. রোড, কোন্নগর, হুগলি)

প্রশ্ন: লব শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?

উত্তর: অনেক খেলার সঙ্গেই। তার মধ্যে ফুটবল, টেনিস তো আছেই।

অর্ঘ্য চট্টখণ্ডি (আন্দুল দক্ষিণপাড়া, হাওড়া)

প্রশ্ন: টি. ভিতে ফ্ল্যাস ব্যাকগুলো কিভাবে তোলা হয়?

উত্তর: আলাদা ক্যামেরায় তোলা হয়।

প্রসেনজিৎ মিশ্র (কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া)

উত্তর: শচীন তেন্ডুলকারের বড় ছবি তো শুকতারায় ছাপা হয়েছে। দেখেছো নিশ্চয়ই। আবার হবে। খেয়াল রেখো।

রত্নজীৎ ভট্টাচার্য (কাছাড়, অসম)

উত্তর: তোমার চিঠি তো এর আগে পাইনি ভাই!

রাজু সাধুখাঁ (হীরাপুর, হাওড়া)

উত্তর: অবন্তী সিনহাকে C/o বি. টি. টি. এ অফিস, গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা-১ এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারো।

শান্তনু সরকার (নিউ আলিপুর দুয়ার, আলিপুর দুয়ার জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন: টেস্ট খেলায় ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর কার? কোন সালে কার বিরুদ্ধে করেছিলেন?

উত্তর: সুনীল গাভাসকারের। ১৯৮৩ সালে মাদ্রাজের ষষ্ঠ টেস্টে গাভাসকার ২৩৬ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

সুকান্তকুমার হেঁস (বাদানগাঙ্গ, হুগলি)

উত্তর: কপিলদেব, মনোজ প্রভাকর আর রামন লাম্বাকে তুমি C/o ডি. ডি. সি. এ. ফিরোজশাহ কোটলা, নিউদিল্লি—এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারো। খেলোয়াড়রা বাড়ির ঠিকানা দিতে চান না।

অরুণাংশু রায় (পূর্বাচলপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলি)

উত্তর: অ্যাথলেটিকসের জন্যে তুমি কলকাতা ময়দানের সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাবের তাঁবুতে যোগাযোগ করতে পারো।

উক্তি

প্রতিযোগিতার আগে আমি যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলাম। আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব পরিশ্রম করেছিলাম। ভালোই তো খেলছিলাম। কিন্তু সেদিন যে কী হলো–মোটে খেলতেই পারলাম না।

–স্টেফি গ্রাফ

(মার্কিন মুক্ত টেনিসের সেমিফাইনালে স্যাম্প্রেজের কাছে হেরে যাবার পর।)

ডেভিড অভিযোগটা আনতে বড্ড দেরি করে ফেলেছে। পাগলের মতো ঐ সব মনগড়া অভিযোগ আনার স্বপ্ন না দেখে ও যদি এখন একটু মন দিয়ে খেলে তাহলে ওরই উপকার হবে।

–কপিলদেব

(ডেভিড গাওয়ারের অভিযোগের উত্তরে। গাওয়ার তাঁর আত্মজীবনীতে কপিলদেবসহ ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে নখ দিয়ে বলের চামড়া ছেঁড়ার অভিযোগ এনেছেন।)

বর্ডার আমার রেকর্ড (দশ হাজার রানের) ভাঙার জন্যে দৌড়চ্ছে। তা ভাঙুক না। আজকাল তো এভারেস্টে অনেকেই উঠছেন। তাঁদের সকলের নাম আমরা জানিও না। কিন্তু তেনজিং-হিলারির নাম সকলেই জানি। আমার রেকর্ড যতোবার খুশি ভাঙুক না কেন, প্রথম দশ হাজার রানের গন্ডি ডিঙিয়েছি বলে সকলেই আমায় মনে রাখবেন।

–সুনীল গাভাসকার

(সম্প্রতি একটি লেখায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বর্ডারের দুর্দান্ত খেলার কথা লিখতে গিয়ে।)

ক্যানসার হাসপাতালের জন্যে টাকা তোলাটা আমার কাছে নেশার মতো। যে যা খুশি বলুক না কেন, আমি টাকা তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবোই। আমার মায়ের নামে ঐ ক্যানসার হাসপাতাল তৈরি করবোই।

–ইমরান খান

(ইমরানের টাকা তোলা নিয়ে ক'জন পাকিস্তানি খেলোয়াড়ের সমালোচনার উত্তরে।)

আমি যতো হারছি ততোই দেখছি আমার বেশি বেশি প্রশংসা করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ সব প্রশংসা পাবার জন্যে আমি মোটেই হারতে চাই না। সত্যিই চাই না। আমি জিততে চাই।

–জন ম্যাকেনরো

(মার্কিন মুক্ত টেনিসে হেরে যাবার পর কাগজে কাগজে ছাপা প্রশংসার উত্তরে।)

লিনেকারের জন্যে

ইংলন্ডের নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় গ্যারি লিনেকার এবার জাপানে যাচ্ছেন। দু বছরের চুক্তি তাঁর সঙ্গে। জাপানে খেলার জন্যে লিনেকার ৩০ লক্ষ পাউন্ড পাবেন। ভারতীয় মুদ্রায় এখন এক পাউন্ডের দাম পঞ্চাশ টাকার ওপর। এইবার হিসেব করে দেখুন লিনেকার কতো টাকা পাচ্ছেন।

খবর-টবর

জাপানে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে থাকা, গাড়ি, বিমানে যাওয়া-আসার টিকিট, লিনেকারের ছেলের লিউকোমিয়া হয়েছে–তার চিকিৎসার সর্বাধুনিক সব ব্যবস্থা এবং লিনেকার আর তাঁর পরিবারের আনুষাঙ্গিক সব খরচই দেবে জাপানের ঐ ক্লাব। ছেলের অসুস্থতার জন্যে লিনেকার ঠিকমতো খেলতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন ইংলন্ডের গোলমেসিন। কিন্তু হালে তিনি গোল করতেই পারছিলেন না। গ্যারি লিনেকারের জন্ম লিস্টারে ১৯৬০ সালের ৩০ নভেম্বর। লিসেস্টার সিটির পক্ষে ফুটবল খেলতে শুরু করেন ১৯৭৮ সাল থেকে। টানা ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ১৯৪টি ম্যাচ খেলে তিনি মোট ৯৫টি গোল করেছেন। ১৯৮৫-৮৬ মরশুমটিতে তিনি খেলেন এভারটনের পক্ষে। সেবছর ৪১টি ম্যাচ খেলে ৩০টি গোল করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে লিনেকার চলে যান বার্সিলোনায়। ৮৯ সাল পর্যন্ত বার্সিলোনার পক্ষে তিনি ৯৯টি ম্যাচ খেলেন এবং গোল করেন ৪৪টি। ১৯৮৯ সালে লিনেকার চলে যান টোটেনহামে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সেখানে তিনি ১০৫টি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ৬৭টি গোল। অর্থাৎ ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষে মোট ৪৩৯টি ম্যাচ খেলে গোল করেছিলেন ২৩৬টি। ইংলন্ডের জাতীয় দলের পক্ষে লিনেকার প্রথম ম্যাচটি খেলেন স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৮৪ সালে। আর শেষ ম্যাচটি এই বছরে সুইডেনের বিরুদ্ধে।

ইংলন্ডের জাতীয় দলের পক্ষে তিনি মোট ৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন এবং গোল করেছেন ৪৮টি। লিনেকার আর কোনোদিন ইংলন্ডের পক্ষে খেলবেন কিনা সন্দেহ। ওঁর বয়েস এখন ৩২। দু বছরের জন্যে তিনি যাচ্ছেন জাপানে। তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে। পরবর্তী বিশ্বকাপে তাঁকে কি ইংলন্ড দলে দেখা যাবে—নাকি তাঁর শূন্য স্থানটি পূর্ণ করার জন্যে নতুন কোনো খেলোয়াড়কে বেছে নেওয়া হবে? তবে এ কথা ঠিক যে লিনেকার দলে না থাকলে দর্শকদের মতো তাঁর সহখেলোয়াড়রাও তাঁকে বড় 'মিস' করবেন।

সুব্রতর জন্যে

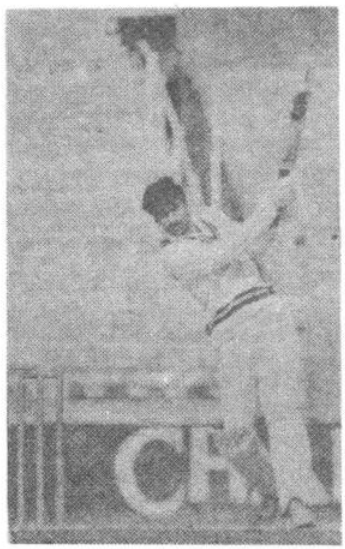

সুব্রত ব্যানার্জি অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে ভালোই খেলেছিলেন। তবু তাঁকে একটির বেশি টেস্টে খেলানো হয়নি। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে তাঁর পারফরমেন্স মোটেই খারাপ ছিলো না, তবু তাঁকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। এখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরগামী ভারতীয় দল গড়ার তোড়জোড় চলছে। দেওধর ট্রফির দুটি খেলায় দুর্দান্ত খেলে সুব্রত তাঁর দাবি জোরদার করে তুলেছেন। সেমিফাইনালে সুব্রত পেয়েছিলেন পাঁচটি উইকেট আর ফাইনালে উত্তরাঞ্চলকে হারানোয় তাঁর ভূমিকা ছিলো প্রধান। মনোজ প্রভাকর, চেতন শর্মা, অতুল ওয়াসন, মনিন্দর সিং, অজয় শর্মা আর রাজদানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ব্যাট করে ৩৫ বলে ৫০ রান করে অপরাজিত ছিলেন সুব্রত। তা ছাড়া উত্তরাঞ্চলের ইনিংসের শুরুতে অজয় জাদেজাকে আউট করে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই পারফরমেন্স এতোই চমকপ্রদ ছিলো সেঞ্চুরি করা ও দুটি উইকেট পাওয়া সত্ত্বেও মনোজ প্রভাকারকে ম্যান অফ দা ম্যাচ করা হয়নি।। ম্যান অফ দা ম্যাচ হয়েছেন সুব্রত ব্যানার্জি। এবং মূলত তাঁর কৃতিত্বের ওপর ভর করেই পূর্বাঞ্চল প্রথম দেওধর ট্রফি জিতলো। এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে পূর্বাঞ্চলের ছেলেরা একদিনের ক্রিকেটে অচল। সৌরভ গাঙ্গুলির ওপর আমাদের যথেষ্ট আশা ছিলো। কিন্তু তিনি এই ম্যাচে একেবারেই সুবিধে করতে পারেননি। অথচ নির্বাচকদের চোখে পড়ার জন্যে এই ম্যাচটি তাঁর ভালো খেলার দরকার ছিলো।

ভারতীয় ক্রিকেটের জীবন্ত কিংবদন্তী প্রফেসর দেওধরের নামে ১৯৭৩।৭৪ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা চলছে। উনিশ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম পূর্বাঞ্চল এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো। ফাইনাল খেলার দিন সকালে কাঁধে ব্যথার জন্যে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক কপিলদেব দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তা সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চল দলটির শক্তি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিলো না। অজয় জাদেজা, নবজ্যোৎ সিং সিধু, মনোজ প্রভাকর, অজয় শর্মা, ভাস্কর পিল্লাই, চেতন শর্মা, অতুল ওয়াসন, মনিন্দর সিং, রাজদানের মতো খেলোয়াড় ছিলেন উত্তরাঞ্চল দলে। সে তুলনায় পূর্বাঞ্চলের শক্তি ছিলো অনেক সীমিত। খেলা শুরু হতেই তার প্রমাণ মিলেছিলো। ৫০ ওভারে মাত্র ৪টি উইকেট হারিয়ে উত্তরাঞ্চল করেছিলো ২৫৪ রান। মনোজ প্রভাকর ১১৭ রানে অপরাজিত ছিলেন। অজয় শর্মা ৬২ আর ভাস্কর পিল্লাই ৫২ রান করলেন। পূর্বাঞ্চলের সুব্রত ব্যানার্জি, সাগরময় সেন শর্মা আর অবিনাশকুমার একটি করে উইকেট পেয়েছিলেন। উত্তরে পূর্বাঞ্চল ৯টি উইকেট হারিয়ে করলো ২৫৭ রান। (উত্তরাঞ্চল এক ওভার কম বল করায় পূর্বাঞ্চল ৯টি পেনাল্টি রান পেয়েছিলো)। লালচাঁদ রাজপুত ৭৫, অরুণলাল ৩৫, চন্দ্রকান্ত পন্ডিত ৫২ আর সুব্রত ব্যানার্জি অপরাজিত ৫০ রান করলেন। এবং পূর্বাঞ্চল জিতলো এক উইকেটে। উত্তরাঞ্চলের মনোজ, ওয়াসন, অজয় ২টি করে আর চেতন, মনিন্দর আর রাজদান ১টি করে উইকেট পেয়েছিলেন।

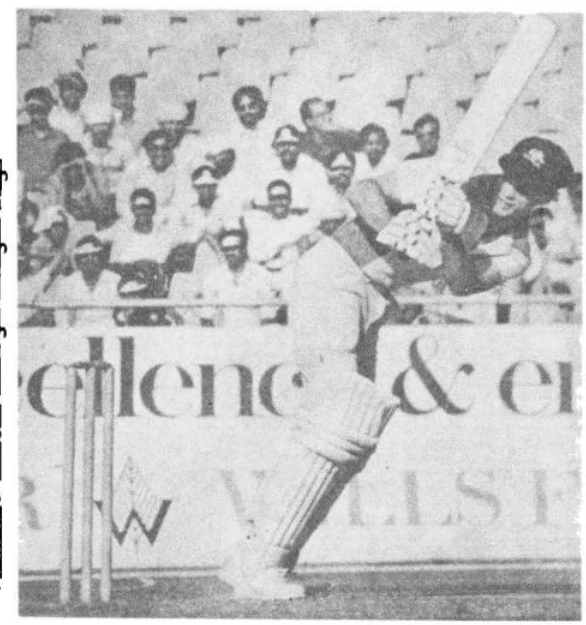

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক কেপলার ওয়েসেলস।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন ঃ

১. বিশ্বে মাত্র একজন দাবা খেলোয়াড় আছেন যিনি আমৃত্যু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ?

২. কোনো টেস্ট খেলোয়াড় বলেছেন, আমাকে যদি আবার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে হয় তাহলে আমি চাই কপিলদেব হতে। একথা কে বলেছেন ?

৩. ভারতের কোন দাবা খেলোয়াড় 'ইন্ডিয়ান কোবরা' নামে পরিচিত ?

৪. ভারতের মিডিয়াম পেস বোলারদের মধ্যে সব থেকে জোরে বল করেন কে ?

৫. এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি হাঁকানোর রেকর্ড কার ?

৬. অস্ট্রেলিয়ার কোন টেস্ট খেলোয়াড় অবসর গ্রহণ করার পর এখন দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে খেলছেন ?

৭. প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সব থেকে তাড়াতাড়ি হাফ সেঞ্চুরি করার রেকর্ড কার ? কতো মিনিটে কতো রান ?

৮. প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দলের শেষ ব্যাটসম্যান (১০ নম্বর) হিসেবে খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করেছেন কে ?

৯. টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড কার ? তিনি কার বিরুদ্ধে কোন সালে কোথায় ঐ কৃতিত্ব অর্জন করেন ? তিনি ভেঙেছেন কার রেকর্ড ?

১০. টেস্ট ক্রিকেটে পর পর পাঁচটি ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইভার্টন উইকস। তিনি কার বিরুদ্ধে কোথায় কোথায় কতো রান করেছিলেন ?

১১ ভারতের কজন ব্যাটসম্যান একই টেস্টের দু ইনিংসে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেছেন ? কোন দেশের বিরুদ্ধে, কোথায় এবং কতো রান তাঁরা করেছিলেন ?

উত্তর ঃ

১. আলেকজান্ডার আলেখিন।

২. অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল।

৩. কলকাতার ক্ষুদে দাবাড়ু সূর্যশেখর গাঙ্গুলি।

৪. শ্রীনাথ।

৫. ভারতের সন্দীপ পাটিলের।

৬. দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক কেপলার ওয়েসেলস। ওয়েসেলস অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলেছেন। টেস্ট খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষেও।

৭. নটিংহামে–লিস্টার্সের সঙ্গে নটিংহামের খেলায় সি. সি. ইনম্যান ৮ মিনিটে ৫৭ রান করেছিলেন–১৯৬৫ সালে।

৮. ভারতের সুঁটে ব্যানার্জি। সারের বিরুদ্ধে।

৯. স্যার লেন হাটনের ৩৬৪ রানের রেকর্ড ভেঙে গ্যারি সোবার্স ১৯৫৭-৫৮ সালে কিংসটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩৬৫ রানে অপরাজিত থেকে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড গড়েন।

১০. ১৪১ রান ইংলন্ডের বিরুদ্ধে কিংসটনে ১৯৪৭-৪৮ সালে।
১২৮ রান ভারতের বিরুদ্ধে দিল্লিতে ১৯৪৮-৪৯ সালে।
১৯৪ রান ভারতের বিরুদ্ধে বোম্বাইএ ১৯৪৮-৪৯ সালে।
১৬২ ও ১০১ রান ভারতের বিরুদ্ধে কলকাতায় ১৯৪৮-৪৯ সালে।

১১. মাত্র দুজন। বিজয় হাজারে ও সুনীল গাভাসকার। হাজারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এডিলেডে ১৯৪৭-৪৮ সালে ১১৬ ও ১৪৫ রান করেছিলেন। সুনীল গাভাসকার পোর্ট অফ স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭০-৭১ সালে ১২৪ ও ২২০ রান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করাচিতে ১৯৭৮-৭৯ সালে ১১১ ও ১৩৭ রান এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১০৭ ও অপরাজিত ১৮২ রান করেছিলেন।

ক্লাব পরিচিতি

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড : জর্জ বেস্ট, ববি চার্লটনের ক্লাব

সুমন ভট্টাচার্য

তারিখটা ২৯ মে, সালটা ১৯৬৮। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইউরোপীয়ান কাপের ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড মুখোমুখি হয়েছে ইউসেবিও-র দুরন্ত বেনেফিকার। পর্তুগালের ঐ দলটিতে সেবার ছিলেন কলুনা, টোরেস, ক্রুজের মতো তারকা খেলোয়াড়রা। সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন দুবারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন বেনেফিকা সহজেই জিতবে। কিন্তু লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে সেদিন এক অন্য ইতিহাস লেখা হলো। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অতিরিক্ত সময়ে বেনেফিকাকে উড়িয়ে দিল ৪-১ গোলে। ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে প্রথমে গোল করে এগিয়ে দেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত তারকা ববি চার্লটন। বেনেফিকার হয়ে গ্রাকা গোল শোধ করে দিলেও অতিরিক্ত সময়ে বেনেফিকাকে শেষ করে দেন আইরিশ তারকা জর্জ বেস্ট, কিড আর চার্লটন। অনেকে বলেন সেদিন ওয়েম্বলিতে বেনেফিকাকে শেষ করে দেওয়ার পিছনে যতটা অবদান ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের বিশ্ববিখ্যাত কোচ ম্যাট বুসবির বা ববি চার্লটনের তার চেয়েও বেশি অবদান ছিল বেস্টের। বিশ্বকাপে জীবনে খেলতে না পাওয়া বেস্ট সেদিন প্রমাণ করেছিলেন তিনি কত বড় খেলোয়াড়। বেনেফিকার কলুনা, টোরেসের কড়া ট্যাকলকে সেদিন তিনি চুপ করিয়েছিলেন তাঁর বিস্ময়কর পায়ের কাজ দিয়ে।

ইংল্যান্ডের এই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ক্লাবের ইতিহাস অবশ্য আরো প্রাচীন। ১৯০৮ সালে তারা প্রথম প্রচারের আলোকে আসে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। পরের বছরই তারা এফ. এ. কাপ জেতে। ১৯১১তে তারা আবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েম্বলিতে ব্ল্যাকপুলকে ৪-২ গোলে পর্যুদস্ত করে। কিন্তু পরবর্তী ৩৭ বছর তারা সাফল্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। এই অবস্থা কাটিয়ে

উঠতে ১৯৪৫-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ওল্ড ট্রাফোর্ডে ক্লাবের ডিরেক্টররা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। স্কটল্যান্ড ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির উইং হাফ ম্যাট বুসবিকে ক্লাবের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ইংল্যান্ড তথা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ক্লাব রূপে গড়ে তোলে।

১৯৪৫-৪৬-এর মরশুম থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে ৫ বার তারা লীগে রানার্স হয়। ১৯৫২তে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে ম্যাট বুসবির সেই বিখ্যাত দল, যাদের ইউরোপে পরিচিতি হয় "বুসবি বেবস" নামে। এই দলের তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন কিংবদন্তীসম জনি কারে, যিনি সমস্ত পজিশনে খেলতে পারতেন। ছিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ড জ্যাফ রাউলে এবং ফুলব্যাক জনি অ্যাস্টনের মতো খেলোয়াড়রা। ১৯৫৬ সালে তারা ইংল্যান্ডের ফুটবল ইতিহাসে রেকর্ড করে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে লীগ জেতে। তাদের সেই দুরন্ত দলে ছিলেন ডানকান এডওয়ার্ডস, এডি কোম্যান, ডেনিস ভায়োলেট, ডেভিড পেগের মতো অসাধারণ খেলোয়াড়রা। পরের বছরও তারা লীগ নিজেদের দখলে রাখে এবং এফ. এ. কাপেও রানার্স হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে তারা ইউরোপীয়ান কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছায়। ১৯৫৮ সালেও তারা তাদের ইউরোপীয়ান কাপ অভিযান শুরু করে।

১৯৫৮র ৬ ফেব্রুয়ারি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফুটবল ইতিহাসে এক কালো দিন। মিউনিখের কাছে এক ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনায় তাদের দলের আটজন খেলোয়াড় (জিওক বেন্ট, রজার বায়ার্ন, টিম টেলর, ডানকান এডওয়ার্ড, এডি কোম্যান, লিয়্যাম হুইল্যান, মার্ক জোন্স, ডেভিড পেজ) সহ ট্রেনার টম কুরী, কোচ বার্ট হোয়েলী ও সচিব ওয়াল্টার ক্রিকনার মারা যান। দলের সফরসঙ্গী আটজন সাংবাদিকও মারা যান। ম্যাট বুসবি সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে সহকারী ম্যানেজার জিমি মারফি দায়িত্ব নেন। দ্রুত দল পুনর্গঠন করে তারা সেবছরও এফ. এ. কাপের ফাইনালে পৌঁছয়। কিন্তু অ্যাস্টনভিলার কাছে হেরে যায়।

প্রকৃতপক্ষে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তাদের ক্ষতি পরিপূরণ করতে সমর্থ হয় ৬০-এর দশকে। এই সময় তাদের ছোটোদের দলটিও বুসবির প্রশিক্ষণে ইংল্যান্ড সেরা হয়ে ওঠে এবং ১৯৬৩-৬৭, টানা ৫ বার ইয়ুথ এফ. এ. কাপ জিতে নেয়। ম্যাট বুসবির দীর্ঘকালের স্বপ্ন সফল হয় যখন ১৯৬৮তে প্রথম ব্রিটিশ দল হিসাবে ইউরোপীয়ান কাপ জেতে। যদিও তারা সেবার বিশ্বক্লাব কাপের ফাইনালে এস্টুডিয়ান্স ডিলা প্লাটার কাছে ২-১ গোলে হেরে যায়।

সত্তরের দশকে তারকাদের বিদায়ের পরে তাদের দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যেতে হয়, কিন্তু তারা আবার প্রথম ডিভিশনে ফিরে আসে। ১৯৭৭ সালে তারা এফ. এ. কাপও জেতে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এখনো ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল।

পড়ার সঙ্গে খেলা

হরিনাভি ডি. ভি. এ. এস. স্কুল

চন্দন রুদ্র

উনিশ শতকে বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার স্রষ্টা পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৬৬ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভিতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নাম হরিনাভি স্কুল। সেদিন সমাজ সংস্কারের অদম্য ইচ্ছা আর শিক্ষা প্রসারের অভিপ্রায় থেকেই দ্বারকানাথ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। বর্তমানে শিক্ষায়তনটির নাম হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল। ১৯৬৬ সালে শতবার্ষিক উৎসবের সময় থেকে স্কুলটি ঐ নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত হয়। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর নানা সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র, পথের পাঁচালিকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌গণের শিক্ষাদানে স্কুলটি একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১২৫ বছর পেরিয়ে আসা এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ছাত্ররা লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধূলাতেও যথেষ্ট পারদর্শী। ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্সে ছাত্ররা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। বর্তমান প্রধান শিক্ষকমহাশয় সুনীলকুমার শাহ বললেন, 'আমাদের নজরটা প্রধানত পড়াশুনার দিকেই থাকে। তবে পাশাপাশি খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়েও আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহী করে থাকি।' তিনি জানালেন, এবারের মাধ্যমিকে স্কুলের পাশের হার ৯৮ শতাংশ। প্রথম বিভাগে ৩২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮০ এবং তৃতীয় বিভাগে ৩২ জন উত্তীর্ণ হয়।

কথা হচ্ছিল স্কুলের ক্রীড়া প্রশিক্ষক দুর্গাচরণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। এখানে আসার আগে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগে ন'বছর অধ্যাপনা করেছেন। দুর্গাবাবু জানালেন, এই স্কুলের তিনটি ইন্টার সেকশন ফুটবল টুর্নামেন্ট রয়েছে। বিভূতিভূষণ স্মৃতি কাপ, পুলীনবিহারী বসু কাপ এবং সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তী কাপের খেলাগুলি প্রতিবার নিজেদের মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়। এই সব টুর্নামেন্ট থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা অনূর্ধ্ব ১৪ বছরের গোষ্ঠ পাল ট্রফিতে স্কুল টিমের হয়ে খেলতে যায়। '৮৯তে সোনারপুর জোনের খেলায় এই স্কুল সেমিফাইনালে ওঠে। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, এ মরশুমে মহামেডান দলের গোলরক্ষক অতনু ভট্টাচার্য এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র, যিনি তিন প্রধান দল ছাড়াও সর্বভারতীয় এবং এশীয় অলস্টার দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মোহনবাগানের অমিত ভদ্র এবং মহামেডানের আর এক ফুটবলার রূপক চৌধুরীও হরিনাভি স্কুলের ছাত্র। এ ছাড়া এই স্কুলেরই ছাত্র টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমির রাজীব দে বর্তমান সুপার ডিভিশনে কুমারটুলিতে খেলছে।

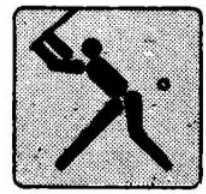

শুরু থেকেই সি. এ. বি. ক্রিকেটে এই স্কুল অংশগ্রহণ করে বেশ কয়েকবার ফাইনালে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ৯০এর থামস আপ ট্রফিতে হরিনাভি স্কুল অল বেঙ্গল ফাইনালিস্ট। গত বছর অবশ্য মূলপর্বের সেমিফাইনালে সাউথ পয়েন্টের কাছে স্কুল হেরে যায়।

অ্যাথলেটিক্সে নবম শ্রেণীর ছাত্র দেবাশিস দাস অনূর্ধ্ব ১৭ বয়সী বিভাগে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজ্য স্তরের দু'তিনটি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম ও তৃতীয় স্থান দখল করে। যোগ-ব্যায়ামে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র পার্থ সেন '৮৯-৯০ সালের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চল থেকে প্রথম স্থান পায়। স্কুলে ইন্ডোর গেমস হিসেবে টেবিল টেনিস ও ক্যারামের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৯১ সালে ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উদ্যোগে এ রাজ্যের ৩১টি স্কুল প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও তার মান উন্নয়নের পন্থা স্থিরীকরণের কাজে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে হরিনাভি ডি. ভি. এ. এস. স্কুলও ছিল। স্কুলের ছাত্ররা শিক্ষকদের সহযোগিতায় স্থানীয় রাজপুর পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ড সার্ভে করে ১২৩ প্রজাতির পাখি, ৪০ প্রজাতির প্রজাপতি, ১০০ রকমের স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী এবং ১০০টি ভিন্ন প্রজাতির গাছের সন্ধান পায়। এজন্য ডি. এস. টি-র পক্ষ থেকে স্কুলকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। কয়েকজন শিক্ষক জানালেন, এখানকার নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য সংরক্ষণেও হরিনাভি স্কুলের ছাত্রদের ভূমিকা রয়েছে।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

পা ফাঁক রেখে বৈঠক

অনেকেই আমার কাছে চিঠি লিখে পায়ের পেশী উন্নতি করার ব্যায়াম আর লম্বা হওয়ার ব্যায়াম জানতে চেয়েছো। আমি কথা দিচ্ছি, লম্বা হবার কয়েকটি ব্যায়াম তোমাদের শেখাবো। নিয়মিত করে দেখো, উপকার পেলেও পেতে পারো। তবে আমি বলি কী জানো– কে লম্বা, কে বেঁটে এই মনঃকষ্টে না ভুগে শরীরটাকে সুন্দর কর, দেখবে তখন অনেকেই তোমার শরীরের প্রশংসা করবে। কেউ ভুলেও বলবে না তুমি বেঁটে না লম্বা। তা বলে তোমাদের আমি লম্বা হবার চেষ্টা থেকে বিরত করছি না। আমি বলতে চাইছি–নিজ নিজ উচ্চতাতেই সুন্দর শরীর গড়া যায়। আজকের এই ব্যায়ামটি শরীরের নিম্নাংশের ভাল ব্যায়াম। উপকারও পাওয়া যায় অনেকগুলি–

১) থাই বা উরুর পেশীর উন্নতি হয়।

২) পাছা ও পায়ের অতিরিক্ত মেদ কমায়।

৩) যারা নানান খেলাধূলা করছো তাদের ক্ষিপ্রতা বাড়াবে, যা খেলাধূলার উন্নতিতে একান্ত দরকার।

৪) পায়ের বিভিন্ন বাতজনিত ব্যথা ভাল হতে সাহায্য করে।

দু'পায়ের মাঝে ৩/৩ ½ ফুট ফাঁক রেখে দাঁড়াও পিছনের মেয়েটির মতো। এখন শ্বাস নিতে নিতে সামনের মেয়েটি যে ভাবে বসেছে সেই অবস্থানে চলে এসো। যখনই তোমার কাফ বা পায়ের ডিমের সঙ্গে বাইসেপস অফ থাই বা উরুর পিছনের অংশ স্পর্শ করবে তৎক্ষণাৎ শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে উঠতে আরম্ভ করো। আবার শ্বাস নিতে নিতে একই ভাবে বিপরীত দিকে বসো।

দুদিকে বসা ও মাঝে একবার দাঁড়ানো নিয়ে একবার হলো। প্রতি মাত্রায় ৮/১০ বার বা সাধ্য মতো অভ্যাস করবে। দু'তিন মাত্রায় অভ্যাস করো। যখন ব্যায়ামটি করবে বসা অবস্থান থেকে দাঁড়ানো অবস্থানে এসেই আবার বিপরীত দিকে বসবার অবস্থানে চলে যেও। এক কথায় কোনো অবস্থানেই থেমে যাবে না। পুরো মাত্রায় করে তবেই একটু বিশ্রাম নেবে। বিশ্রামের সময় পায়চারি করবে। প্রথম প্রথম বসতে গিয়ে যদি শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে দেখ অর্থাৎ পড়ে যাও, তখন একটা লাঠি ধরে অভ্যাস করবে। খুব সাবধানে করবে। তাড়াহুড়ো করে করতে গিয়ে পায়ে চোট লাগিয়ে ফেল না যেন।

কপট তপস্বী

অনাথবন্ধু রায়

একবার দুই সখা শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন নদীতীরে গল্প করতে করতে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কথায় কথায় অর্জুন জানতে চাইলেন, আচ্ছা সখা, এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠা দাতা কে বলে তোমার মনে হয়?

কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, কেন কর্ণ। ওর মতো দানবীর আর কে হতে পারবে?

কৃষ্ণের উত্তর শুনে অর্জুন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, না সখা, তোমার কথা মেনে নিতে পারছি না। আমার তো মনে হয় দাদা যুধিষ্ঠিরই এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ দানী।

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, আমি কিন্তু কর্ণ ছাড়া আর কাউকে দেখছি না।

অর্জুন তবুও অনড়। —আমি তোমার কথা মানতে রাজী নই সখা, তা তুমি যতই বল না কেন।

—বেশ তো, শ্রীকৃষ্ণ বললেন, চল না একবার পরীক্ষা করে দেখাই যাক দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানী কে।

—বেশ চল, দেখাই যাক। তবে একটা কথা বলে রাখছি, তোমায় কিন্তু এবার হার স্বীকার করতেই হবে, সখা। আমি তো দাদাকে জানি।

শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন, তুমি একজনকে জান কিন্তু আমি যে দুজনকেই জানি সখা। চল মনে সংশয় রেখে লাভ কি?

দুই সখা তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। পরিপাটি আর নিঁখুত ছদ্মবেশে তাঁদের আর চেনার উপায় রইল না। দুই সুন্দরকান্তি তপস্বী তারপর যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হলেন।

তখন বর্ষাকাল। পথে আসতে আসতে দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজে গেছেন। প্রহরারত দ্বারপালকে তাঁরা বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দাও আমরা তাঁর দর্শনপ্রার্থী। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ত্রস্তপদে করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন। তপস্বীদের বেশবাস দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, একী আপনারা সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন ভিতরে এসে আসন গ্রহণ করুন। ওরে, কে আছিস, তপস্বীদের জন্য বস্ত্র নিয়ে আয় শীগগির।

শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বললেন, না না, বস্ত্রের কোনো দরকার নেই মহারাজ। আমরা এখুনি আশ্রমে ফিরে যাব। সেখানে গুরুদেব আমাদের অপেক্ষায় আছেন। আপনার কাছে কি প্রয়োজনে এসেছি সেটাই আগে বলি। হোমের জন্য আমাদের কিছু চন্দন কাঠের দরকার। আশ্রমে এক খণ্ডও চন্দন কাঠ নেই। তাই এই বর্ষার মধ্যে আমদের বেরোতে হয়েছে তারই সন্ধানে। বর্ষাকালে বনে শুকনো কাঠ পাওয়া দুষ্কর। আপনি রাজা, আপনার এখানে থাকবেই এই ভরসাতে বৃষ্টি মাথায় করে এসেছি। এখন আপনি আমাদের চিন্তামুক্ত করুন এই মিনতি।

—কিন্তু.....আচ্ছা, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি কি করতে পারি।

কিছু পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির ম্লান মুখে ফিরে এলেন। অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জানালেন, আমি বড়ই দুঃখিত তপস্বী। প্রাসাদেও এই মুহূর্তে এক খণ্ড চন্দন কাঠ নেই। এখন বর্ষাকাল নয়তো বন থেকেও কাঠ আনার ব্যবস্থা আমি এখুনি করে দিতাম। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য আপনাদের কোনো সেবাই করতে পারলাম না।

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, না না মহারাজ, এতে দুঃখিত হবার কি আছে? চন্দন কাঠ নেই তো আপনি কি করতে পারেন। আচ্ছা, এবার আমরা আসি মহারাজ—আপনার জয় হোক।

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। দুজন এবার চললেন কর্ণর প্রাসাদের উদ্দেশে। যেতে যেতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, সখা, তোমার এ কী রকম বিচিত্র পরীক্ষা?

—কেন? শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভেবে দেখ, পরীক্ষাটা কি একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে না? এ ঘন ঘোর বর্ষায় শুকনো চন্দন কাঠ দুর্লভ বলেই আমার মনে হয়। কর্ণও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

—সেটাই তো এবার দেখতে যাচ্ছি, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন।

দুজনে কর্ণের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হয়ে দ্বারপালকে দিয়ে কর্ণকে সংবাদ পাঠালেন যে দুই তপস্বী মহারাজার দর্শনপ্রার্থী।

সংবাদ পেয়ে কর্ণ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে তপস্বীদের প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তাঁদের আসন দিয়ে বললেন, আদেশ করুন আমি আপনাদের কি সেবা করতে পারি। তবে আপনারা সিক্ত বস্ত্রে রয়েছেন, প্রথমে ওগুলো পাল্টে নিন তারপর কথা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুললেন, না না মহারাজ, ব্যস্ত হবেন না। আমাদের বস্ত্র পাল্টাবার দরকার নেই। আমাদের যা প্রয়োজন তা বলি। হোমের জন্য আমাদের কিছু শুকনো চন্দন কাঠ দরকার। আশ্রমে না থাকায় আমরা তা সংগ্রহ করতে আপনার কাছে এসেছি। এই বর্ষায় বনেও এখন শুকনো কাঠ পাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো আপনার প্রাসাদে থাকতে পারে এই আশা নিয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।

—চন্দন কাঠ? হ্যাঁ আছে। আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনই তার ব্যবস্থা করছি। তার আগে আপনারা সামান্য ফলমূল তো গ্রহণ করতে পারেন?

—তারও কোনো প্রয়োজন নেই,মহারাজ। হোমের আগে আমরা কোনো কিছুই গ্রহণ করতে পারি না, শ্রীকৃষ্ণ বললেন।

—বেশ আপনাদের যা ইচ্ছা। এই বলে কর্ণ এক ভৃত্যকে আদেশ দিলেন একটা কুঠার নিয়ে আসতে। ভৃত্য কুঠার এনে দিলে কর্ণ স্বহস্তে একের পর এক দরজা-জানালার কপাট, খাট, পেটি এবং চন্দনকাঠের তৈরি সব আসবাব ও জিনিসপত্র কেটে স্তূপীকৃত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, শান্ত হোন মহারাজ, করছেন কি! প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু কাঠ যে ছিল না তা তো আপনি বললেই পারতেন। আমরা অন্যত্র চেষ্টা করতাম। এভাবে মূল্যবান কারুকার্য করা সামগ্রী নষ্ট করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

—নষ্ট! কি বলছেন তপস্বী! এই সমস্ত সামগ্রী আপনাদের প্রয়োজন মেটাবে এটাই যথেষ্ট নয় কি? এ সব সামগ্রী আবার তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আপনাদের সেবা করার সুযোগ হয়তো জীবনে আর নাও আসতে পারে। এবার আদেশ করুন ভৃত্য আপনাদের আশ্রমে এই কাঠ পৌঁছে দিয়ে আসুক।

—না না, তার কোনো প্রয়োজন নেই। এই কাঠ আমরা দুজনে নিয়ে যেতে পারব। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মহারাজ। আপনার জয় হোক।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কাঠ নিয়ে মহারাজকে আশীর্বাদ করে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, সখা, যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে কি চন্দন কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ছিল না? না, সেগুলো এতই মূল্যবান যে তাদের কেটে নষ্ট করা যায় না? এবার তুমিই বিচার কর শ্রেষ্ঠ দানী কে। আমার মনে হয় কর্ণকে শ্রেষ্ঠ বলতে তোমার আর কোনো আপত্তি থাকবে না।

অর্জুন অধোবদনে রইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সখা, কাঠের বোঝা গাছতলায় রেখে দাও। আর এস তপস্বীর ছদ্মবেশও এবার খুলে ফেলি। এই কাঠ প্রয়োজনবোধে কেউ নিয়ে যাবে, আমরা তো কপট তপস্বী মাত্র। কথা শেষ করে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ।

ছবি : শুকতারা রায়

সুবোধচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার

প্রয়াত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছানুসারেই বিগত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে 'সুবোধচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার'-এর মাধ্যমে। মেধাভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান ও সম্মান জানানো ছাড়াও এ পুরস্কারের নির্দিষ্ট কিছু অর্থমূল্য আছে। এই অর্থমূল্য যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর জন্য ৫০০০, ৩০০০ ও ২০০০ টাকা।

গত ১৯৮৯, ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন—

১৯৮৯	দেবাশিস গোস্বামী □	বারাসাত গভঃ হাই স্কুল	১ম
,,	সন্দীপ সিংহরায় □	রামকৃষ্ণ মিশন, পুরুলিয়া	২য়
,,	শৈবাল সাহা □	কুচবিহার জেন্‌কিনস্‌ স্কুল	৩য়
১৯৯০	সুমন্ত তেওয়ারী □	রামকৃষ্ণ মিশন, পুরুলিয়া	১ম
	রাজা মুখোপাধ্যায় □	ঐ	২য়
,,	শৌভিক মণ্ডল □	ঐ	৩য়
১৯৯১	ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় □	রামকৃষ্ণ মিশন, পুরুলিয়া	১ম
	প্রবুদ্ধ চক্রবর্তী □	সাউথ পয়েন্ট স্কুল	২য়
	শুভ্রজিৎ দাস □	রামকৃষ্ণ মিশন, পুরুলিয়া	৩য়

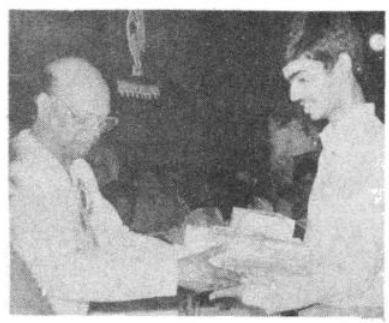

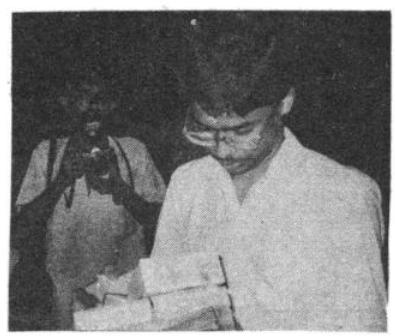

ছদ্মবেশে ম্যাম'জেল এক্স (গত সংখ্যার পর)

ঠিক বলেছো.....আন্দ্রে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ওকে বাদ দিয়েও তো আমরা কিছুই করতে পারবো না। মনে হচ্ছে, কিছুদিনের জন্যে আমাদের প্রতিরোধ অভিযানের কথা ভুলে যেতে হবে।
বলছেন কী! এতে যে আন্দ্রের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ওর এতোদিনের এতো প্রস্তুতি, এতো পরিশ্রম সব বিফলে যাবে।

সময় নষ্ট না করে চলো।
ওরা যদি বৃটেন থেকে আর একজন নেতাকে পাঠায় তাহলে তিনি হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু.....
দাঁড়ান! শুনুন যে গেস্টাপো এজেন্ট আন্দ্রেকে গ্রেপ্তার করেছিলো, সে এখন আমার বন্দী—এখন আর তার কাছ থেকে আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই.....

আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, আমি শুধু আন্দ্রেকেই মুক্ত করবো না, নাজিদের ওপর আপনাদের আক্রমণ হানার ব্যবস্থাও করে দেবো। জেনারেল ব্রাউউইসের সদর দপ্তরটা দখল করে নিলে কেমন হয়?
কি পাগলের মতো বকছো!
ও আমাদের বোকা বানাচ্ছে!

অবাক হয়ে ওঁরা ঘুরে দাঁড়ালেন।
এখন কি আপনারা আন্দ্রেকে মুক্ত করার আর নাজিদের ব্যাপারে আমার পরিকল্পনার কথা শুনবেন?
একজন দুঁদে গেস্টাপো এজেন্টকে যখন তুমি বন্দী করেছো তখন তোমার কথা শুনতেই হবে ম্যাম'জেল। বলো কি তোমার পরিকল্পনা.....
[চলবে]

সত্যি !

প্রতিশোধ পূর্ণ হলো

ঘটনার সময়কাল ১৬৮১ সাল। ইংলন্ডের ডারহ্যাম কাউন্টির এক জাঁতাকলের মালিক জেমসের গভীর রাতে আচমকাই ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চেয়ে দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি। মাথায় তার পাঁচটা ক্ষত। মূর্তিটি বলে তার নাম হচ্ছে অ্যানি ওয়ালকার। তারই এক আত্মীয় লোক লাগিয়ে তাকে খুন করেছে। জেমস যেন ঘটনাটা পুলিশকে জানায়।

নিজের চোখে যা দেখেছিলেন জেমস প্রথমে তা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই তিনি চুপচাপ বসেছিলেন। কিন্তু ভূতে তাঁকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিল না। মূর্তিটি প্রায় এসে তাঁকে দেখা দিতে লাগল। প্রথমে কাকুতিমিনতি, পরে ভয় দেখিয়ে সে জেমসকে পুলিশের কাছে পাঠাল। জেমসের কথা শুনে আর মূর্তিটির দেখিয়ে দেওয়া একটি গর্ত খুঁড়ে পুলিশ অ্যানির মৃতদেহ পেল। তার আত্মীয় ও খুনীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পরে বিচারে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। অ্যানির প্রতিশোধ নেওয়া শেষ। এরপর সে আর কোনোদিন দেখা দেয়নি জেমসকে।

কে ছিলেন ওই মহিলা ?

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের বাসিন্দা মিঃ ও মিসেস পল ম্যাকাহেন গিয়েছিলেন গ্রান্ড ক্যানিয়ন বেড়াতে। ১৯৫৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বেশ সকাল সকালই তাঁরা পৌছে যান সেখানে। সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেড়াতে দুজনেই দেখলেন একজন ভদ্রমহিলা আর এক ভদ্রলোক তাঁদের মালপত্তর নিয়ে কাছেই একটা কেবিনে ঢুকছেন। মিসেস ম্যাকাহেন ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারলেন। এক বছর আগে তাঁরা দুজনেই জুরি হিসাবে কাজ করেছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস ন্যাশ। মিসেস ম্যাকাহেন তাঁর স্বামীকে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন যে দুর্ভাগ্যবশত ভদ্রমহিলার স্বামীর একটা মাত্র হাত। মিসেস ম্যাকাহেন সেদিন আর মিসেস ন্যাশের সঙ্গে দেখা করলেন না, ভাবলেন পথশ্রমে ওঁরা হয়তো ক্লান্ত।

পরের দিন সকালে ন্যাশ দম্পতিকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে মিসেস ম্যাকাহেন এগিয়ে গিয়ে মিসেস ন্যাশের সঙ্গে কথা শুরু করলেন। তাঁদের স্বামীরাও গল্প জুড়ে দিলেন কথায় কথায় মিসেস ম্যাকাহেন ন্যাশদের জানালেন যে আগের সন্ধ্যাতেই তিনি তাঁদের দেখেছেন। শুনে তো ন্যাশ দম্পতি আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁরা ম্যাকাহেনদের সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন যে ওইদিন সকালেই অন্যান্য টুরিস্টদের সঙ্গে তাঁরা গ্রান্ড ক্যানিয়নে পৌছেছেন, আগের দিন নয়। তবে ম্যাকাহেনরা আগের সন্ধ্যায় কাদের দেখেছিলেন ? অথচ মিঃ ম্যাকাহেন হলপ করে বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী যখন মিসেস ন্যাশকে চিনিয়ে দেন তখন সেই ভদ্রমহিলা তাঁর থেকে দশ কি পনের ফিট দূরে ছিলেন আর তিনি তাঁকে স্পষ্ট দেখেছিলেন। তাহলে....

চুরি না....

দিনের শেষ। এবার ঘরে ফেরার পালা। ইন্ডিয়ানাপলির ডাউলিং কনস্ট্রাকশনের কর্মীরা তাই কাজ বন্ধ করে দিল। মাটি থেকে ২০০ ফিট ওপরে ক্রেনে ঝুলন্ত আড়াই টনের লোহার বলটাও স্তব্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণ ক্রমাগত লোহা লক্কড় গুঁড়িয়ে চলছিল সেটা। ক্রমে জায়গাটা নিঝুম হয়ে এল। শোরগোল শুরু হবে আবার পরের দিন কাজ আরম্ভর সঙ্গে সঙ্গে। পরের দিন কত বড় বিস্ময় যে অপেক্ষা করছিল কর্মীদের জন্যে তা তারা কেউ ভাবতে পারেনি। কাজে এসে তারা দেখে আড়াই টনের লোহার বলটি উধাও। পুলিশ এল, কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা এলেন কিন্তু সকলেরই ভ্যাবাচাকা অবস্থা। উধাও হয়ে যাওয়া বলটি আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ কি সেই পেল্লায় বলটি চুরি করেছিল না সেটা আপনা আপনি ভেসে কোথাও চলে গিয়েছিল ? সত্যি ! জগতে বোধহয় সবই সম্ভব।

ছবি : সুফি

এসো শিখি জাগলিং

অভয় মিত্র

আমার শুকতারার ভাইবোনেরা আজ তোমাদের ভারি মজার একটা খেলা শেখাব। খেলাটার নাম 'লাঠির খেলা'। যে সে লাঠি নয়। এ হচ্ছে ভেল্কির লাঠি।

একটা প্রায় তিন হাত লম্বা লাঠিকে কাপড় জড়িয়ে একটু মোটা করে নাও। আর তোমাদের দু হাতে প্রায় দেড় হাত লম্বা দুটো ছড়ি ধর। লম্বা লাঠিটাকে মাটির উপরে গড়িয়ে দাও তারপর ডান হাতের ছড়িটা দিয়ে লম্বা লাঠিটাকে ৪৫° কোনাকুনি তুলে ধর। লম্বা লাঠিটা এখন তোমার ডান হাতের ছড়ির ওপর ভর দিয়ে তার অপর প্রান্ত মাটিতে ঠেকিয়ে ৪৫° কোনাকুনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার শরীর একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দাও। এবার ডান হাত দিয়ে এমনভাবে লম্বা লাঠিটাকে পাঠিয়ে দাও যাতে সেটা বাঁ হাতের ছড়ির উপর ৪৫° কোনাকুনিভাবে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফের বাঁ হাত দিয়ে লম্বা লাঠিটাকে এমনভাবে পাঠিয়ে দাও যাতে সেটা আবার ৪৫° কোনাকুনিভাবে ডান হাতের ছড়ির উপর এসে পড়ে। প্রথম প্রথম লম্বা লাঠিটার অপর প্রান্ত মাটিতে স্পর্শ করে থাকবে। এবার একবার ডান হাতের ছড়িটা দিয়ে আর একবার বাঁ হাতের ছড়িটা দিয়ে লম্বা লাঠিটাকে একটু জোরে উপরের দিকে ধাক্কা দাও যাতে লম্বা লাঠিটা শূন্যে ভাসতে থাকে। লম্বা লাঠিটা ডান হাতের ছড়ির উপর ৪৫° কোনাকুনি শূন্যে ভাসবে আবার একবার বাঁ হাতের ছড়ির উপর ৪৫° কোনাকুনি শূন্যে ভাসবে। মজাটা হচ্ছে—বড় লাঠিটা একবার তোমার ডান হাতের ছড়ির উপর আর একবার তোমার বাঁ হাতের ছড়ির উপর এসে পড়বে আর তুমি একটু ধাক্কা দেবে তোমার দুটো ছড়ি দিয়ে লম্বা লাঠিটাকে। দেখবে সেটা হেলে দুলে শূন্যে দুলতে থাকবে। এইভাবে দিন পনেরো অভ্যাস করলে তুমি জাগলিং-এ লাঠির খেলাটা সহজেই শিখে নিতে পারবে।

প্রত্যেকে দুই হাতে দুটি করে দেড় হাত লম্বা ছড়ি ধর। ছড়িগুলো কিসের তৈরি জানো? বাঁশের। আর ঐ লম্বা লাঠিটা হলো বেতের তৈরি। তিন হাত লম্বা একটা বেত নিয়ে কাপড় দিয়ে ভলোভাবে জড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দাও। এর ওজন হবে প্রায় ২০০ গ্রাম। ছড়ি দুটো একটু রঙিন হলেই ভালো হয়। আর লম্বা লাঠিটাকে লাল, নীল, কমলা, হলদে, কালো, সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে জড়াবে যাতে বেশ রংচংয়ে দেখায়। কি মজাটাই না হবে তখন, যখন তোমরা একসঙ্গে দুটো ছড়ি দিয়ে লম্বা লাঠিটাকে নাচাতে পারবে।

মজাটা কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। শূন্যে লম্বা লাঠিটাকে দোলাতে দোলাতে এমনভাবে সামনের দিকে একটু ধাক্কা দেবে যাতে লম্বা লাঠিটার মাথাটা সামনের দিকে চলে যায়, পরক্ষণেই বাঁ হাতের লাঠিটা দিয়ে লম্বা লাঠির মাথাটাকে নিজের কোলের দিকে টেনে নাও। এইভাবে ডান হাতের ছড়িটা দিয়ে সামনে ঠেলো এবং বাঁ হাতের ছড়িটা দিয়ে নিজের কোলের দিকে টেনে নাও। এইবার দেখতে পাবে তোমাদের দুই হাতের দুটো ছড়ি দিয়ে লম্বা লাঠিটাকে বনবন করে শূন্যে ঘোরাতে পারছ।

ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে খেলা দেখালে তোমাদের তো ভালো লাগবেই, যারা দেখবে তাদেরও লাগবে। কারণ জাগলিং-এ লাঠির খেলা একটা মজার খেলা, আনন্দের খেলা। জাগলিং শুধু নিছক আনন্দ দেয় না, শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য এবং মনকে দৃঢ় করার জন্যও জাগলিং-এর প্রয়োজনীয়তা আছে। তোমরা, আমার কিশোর ভাই-বোনেরা এই বয়স থেকে নিয়মিত জাগলিং অভ্যাস কর, পরিণত বয়সে অনায়াসে তোমরা হাত পা নাড়াতে বা ঘোরাতে পারবে। তোমাদের মনের জোরও বেড়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভালোভাবে মন বসাতে পারবে। ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্থ ও সবল দেহে জীবনযাপন করতে পারবে। তোমাদের পক্ষে এটা ভালো নয় কি?

হাঁদা-ভোঁদার

ডাইভ কেলেঙ্কারী

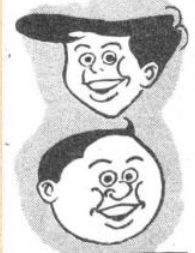

আমি শুধু এর অবস্থানটা সামান্য একটু পাল্টাবো।

এবার কয়েকটা পাতা আমার ওপর ছড়িয়ে দিই।

আরে! ভোঁদা যে! সং সেজে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস?
আরে, আমি এই ঝোপটা লাফিয়ে পার হতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।

ওঃ! এই কথা! তবে তুই যে তোর গোদা দেহ নিয়ে তা পারবি না সেতো জানা কথা। হাইজাম্প কি করে করতে হয়, দ্যাখ।
হ্যাঁ, আমি ঠিক দেখে যাচ্ছি!

একি! আমি কিসের ওপর নেমেছি?

হুর্‌র্‌!

হাঃহাঃ! এটা একটা অসাধারণ ডাইভ ছিলো, হাঁদা। সামনের ঝোপ ডিঙিয়ে বেঞ্চে টোকা মেরে দিয়েছিস!
গর্‌র্‌!

ঘাতক

অংশুমান বসু

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যেই পটল বেরিয়ে পড়ল। মনটা তার একটুও ভালো নেই। মাথার মধ্যে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ পাঁচটা অঙ্কে হাত দিল! কিন্তু একটাও হলো না। প্রথম অঙ্কটাই তো তিনবার করেছে। তিনবারের তিন রকম ফল। বই উল্টে দেখেছে বারবার। ছাপানো লেখার সঙ্গে একটা উত্তরও মেলেনি। খানিকটা হতাশ হয়ে দ্বিতীয় অঙ্কে হাত দিল। এটাও সে তিনবার করেছে। উত্তর মেলেনি। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম—না, কোনোটার উত্তরই বইএ ছাপা ফলাফলের সঙ্গে এক হয়নি। রাগের চোটে কোনো অঙ্কটাই আর দ্বিতীয়বার করে দেখতে ইচ্ছে হয়নি। কোথায় তার ভুল হচ্ছে কে জানে! ওর খুব মেজাজ বিগড়ে যায়। গরমের ছুটিটা মাঠেই মারা যাবে নাকি! এত এত হোমটাস্ক—কিছুই হয়নি। ওদিকে বাইরে ঠাঠা রোদ্দুরে এলোমেলো হাওয়া বইছে। ধুলো উড়ছে। আমবাগানের কোথায় ঘুঘু ডাকছে। বেশ উদাস করা ডাক। কোথায় একটা কাঠঠোকরা একটানা কাঠ ঠোকার আওয়াজ করে যাচ্ছে। শালিকের ঝগড়া আছে। আর আছে মাঝে মাঝে ফ্যাকাশে নীল আকাশে পাক দিয়ে ওড়া চিলের ডাক।

দূর তোর অঙ্ক! বই খাতা ঠেলে ফেলে পটল বাইরে বেরিয়ে আসে। ছাঁকা দেওয়া রোদ বাইরে। গরম বাতাসের হল্কা। পটলের মনে হলো এ সময় আমবাগানের ছায়ায় খানিক ঘুরলে ওর ভালো লাগবে। তাছাড়া আম পাকার সময় হয়ে আসছে। দু চারটে পাকা আমের দেখাও সে পেতে পারে।

আমবাগানের ছায়ায় পটলের শরীরটা জুড়িয়ে গেল। এলোমেলো ঘুরতে থাকে সে। ঘুরতে ঘুরতেই পৌঁছে যায় সিঁদুরে আমগাছটার কাছে। এ গাছের আম পাকলে ভারি সুন্দর রং ধরে। হলুদের উপর সিঁদুর টানা। যেন ফর্সা নূতন বৌ সিঁদুর পরেছে। গাছটার নিচে আসতেই পটল অবাক হয়ে যায়। কে একটা মেয়ে বসে আছে। খুব সুন্দরী। পাকা সিঁদুরে আমের মতোই তার রং। চুপ করে বসে থেকে চুমকি বসানো আকাশ নীল শাড়ির আঁচলটা মাঝে মাঝে চোখে চেপে ধরছে। কে মেয়েটা! কোথায় এর বাড়ি! এ গাঁয়ে তো নয়ই। এ গাঁয়ের সব মেয়ে বৌকে সে চেনে। তবে! ভর দুপুরে আমবাগানে বসে থাকা মেয়েটা কোনো ভূতটুত নয়তো! কথায় বলে না, ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা। পটল একটু ভয় পায়।

নীল শাড়ির আঁচল আবার মেয়েটি চোখে তুলে নেয়। আড়াল থেকে পটল স্পষ্ট দেখে ওর চোখে জল চিকচিক করছে। কাঁদছে নাকি ও! ভূত-পেত্নীরা কাঁদে নাকি আবার! আর কাঁদলেও ওদের চোখে জল থাকে নাকি! ভূত-ফুত নয়, এ নিশ্চয়ই মানুষ। পটল আশ্বস্ত বোধ করে। কিন্তু দুপুরের হাওয়ার এই দাপাদাপির মধ্যে অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি কাঁদে কেন! পটল এগিয়ে যায়।

'তুমি, আপনি কে? কাঁদছেন কেন?'

সিঁদুররঙা মেয়েটি তার বড় বড় দুটো চোখ ফেরায় পটলের দিকে। পটলের মনে হয় দুগ্গা ঠাকুর ওকে দেখছেন। জবাব কিছু দেয় না মেয়েটি।

পটল এবার তাড়া দেয়। 'আপনি কে? এখানে বসে আছেন কেন ভর দুপুরে? কাঁদছেনই বা কেন?'

'আমি প্রকৃতি।' ভারি মিষ্টি গলা মেয়েটির।

'কোথায় আপনি থাকেন? এখানে এই বাগানে কেন এসেছেন?'

'আমি প্রকৃতি। পৃথিবী আমার মা।'

'কি যা তা বলছেন? পৃথিবী তো সবারই মা। কোথায় থাকেন আপনি?'

'আমি যা তা বলি না। আমি প্রকৃতি। সারা পৃথিবীব আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে সর্বত্র আমি আছি। সব ঋতুতেই আমি থাকি।'

পটল থতমত খেয়ে যায় একটু। মেয়েটা পাগল নিশ্চয়। এবার সে আরো গম্ভীর হয়। 'এই আমবাগানে বসে আপনি কি করছেন?'

'আমি তো সব জায়গাতেই থাকি।' প্রকৃতির উত্তরে হেঁয়ালী।

'কিন্তু এখানে থাকার কোনো ঘর নেই।'

'সারা পৃথিবীটাই তো আমার ঘর। রোদে, বাতাসে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে আমিই ঘুরে ঘুরে দেখা দিই।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে তখন থেকে?' পটল খেঁকিয়ে ওঠে এবার। 'ডাকবো নাকি ভোম্বল, গেনো, পটকাদের? টিন বাজিয়ে সারা গাঁ ঘোরাবে।'

'আমি ইয়ার্কি করি না কারো সঙ্গে। তোমরা যাকে প্রকৃতি বলো আমিই সেই।'

তুমি শুনে পটলের খুব রাগ হয়। অচেনা বলে সে এতক্ষণ মেয়েটিকে আপনি বলে কথা বলছিল। নইলে কতই বা ওর বয়স! হয়তো ওরই মতো। কিছু বেশি হতেও পারে। শাড়ি পরেছে বলে বড় লাগছে। ঠিক আছে ঢিলের বদলে ঢিল, তুমির বদলে তুমি।

'আচ্ছা বেশ, তুমিই প্রকৃতি।' পটল অন্য লাইনে যায়। 'কিন্তু এখানে বসে আছ কেন? কাঁদছই বা কেন? কি হয়েছে তোমার?'

প্রকৃতি তার আকাশ নীল শাড়ির চুমকি বসানো আঁচল চোখের উপর চেপে ধরে। 'আমার বড় কষ্ট।'

'তোমার কষ্ট! কিসের কষ্ট?'

'আমাকে স্বাধীন ভাবে থাকতে দিচ্ছে না।'

'কারা থাকতে দিচ্ছে না?'

'তোমরা। মানুষরা।'

যাঃ বাব্বা! মেয়েটা বলে কী! এ ঠিক বদ্ধ পাগল। তাই উল্টোপাল্টা কথা বলছে। আচ্ছা, দেখাই যাক না, পটল ভাবে, কতদূর যায় ও।

'মানুষরা তোমার আবার কি করল? তুমিও তো মানুষ।'

'না, আমি মানুষ নই। আমি প্রকৃতি। আমাকে তোমরা ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছ।'

'সে আবার কী! তোমার শরীরে তো কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।'

'আছে, আছে। অনেক চিহ্ন আছে। দেখবে?'

মেয়েটি পিঠের জামা তোলে। পাকা আমের মতো ফর্সা পিঠটায় কালশিটার লম্বা লম্বা দাগ। একটা দুটো নয়। অনেকগুলো।

'থাক থাক, আর দেখাতে হবে না। কে করল এই কাজ? তোমার স্বামী?'

মাথা নাড়ে মেয়েটা। 'না।'

'তবে শ্বশুর? দেওর?'

'না।'

'বিয়ে হয়েছে তোমার?'

'আমার তো বিয়ে হয় না। প্রকৃতির বিয়ে হয় না।'

'কেন হয় না? এত সুন্দর তোমায় দেখতে!'

'আমি যে প্রকৃতি, পৃথিবীর খেয়ালি মেয়ে। আমাকে বিয়ে করবে কে?'

'যাচ্ছলে! তুমি যে খালি উল্টোপাল্টা কথা বল। তোমায় কে মেরেছে বল। বাবা? দাদা?'

'না, একজনও কেউ নয়।'

'তবে কি পাড়ার লোকেরা মেরেছে? কেন কি করেছিলে?'

'আমায় মেরেছ তোমরা। মানুষরা। এখনও মারছ। যত দিন যাচ্ছে তত বেশি বেশি মারছ।'

'তুমি দেখছি সত্যিই পাগল।' পটল হেসে ফেলে।

'বটে, আমি পাগল! বিশ্বাস হচ্ছে না আমি প্রকৃতি? তবে দেখ।'

হঠাৎ আকাশ কালো করে প্রচন্ড বেগে ঝড় ধেয়ে আসে। আমগাছগুলো থরথর করে কেঁপে ওঠে। পটল খুব ভয় পায়। ভূতের খেলা নয়তো!

'এই দেখ আমি ঝড় হয়ে এসেছি। এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো আমি প্রকৃতি?'

'না। এ তোমার ভূতুড়ে কারসাজি।'

'তাই নাকি! এই নাও বৈশাখের তীব্র দহন।'

চোখের পলকে ঝড় থেমে যায়। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চারদিকে খর বৈশাখের ঝাঁ ঝাঁ রোদ ওঠে। বইতে থাকে ফোস্কা পড়া হাওয়া। আমবাগানের মাটি ফেটে যায়।

পটল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। না, এ তো ভূতুড়ে খেল নয়। প্রকৃতির খেয়ালিপনাই বলে মনে হচ্ছে। তবু একটু দেখা যাক। ও এবার চাইল বৃষ্টি। পলকেই বৈশাখের দারুণ দহনের সমাপ্তি ঘটে। আকাশ কালো করে শ্রাবণের ধারা নেমে আসে। পটল তাড়াতাড়ি শীতের মিষ্টি রোদ চায়। দেখতে দেখতে বৃষ্টি থেমে শীত আসে। গাছের পাতাগুলো হলদেটে হয়ে যায়। হিমেল বাতাস হাড় ফুটো করে শরীরে ঢোকে।

'উঃ বড্ড শীত। বসন্তই ভালো।'

'তাই হোক।'

শীত হঠাৎই শেষ হয়ে যায়। গাছে গাছে নতুন পাতা আসে। আমের মুকুলের গন্ধে মৌমাছির দল ঝাঁক বেঁধে আসে। কোকিল ডাকতে থাকে। পটলের মনে হয় সে এক অচেনা দেশে হাজির হয়েছে।

'হ্যাঁ, তুমিই প্রকৃতি। তুমিই আমাদের পৃথিবীকে নানা রূপে সাজাও।' পটল বলতে থাকে। 'এখন বল, কোন মানুষরা তোমাকে এমন আঘাত করেছে।'

প্রকৃতি হাসে। শান্ত জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ হাসি। 'কোনো বিশেষ মানুষ নয়, সমস্ত মানুষ জাতি আমার সর্বনাশ করছে।'

'পৃথিবীর সব মানুষ! সব্বাই!'

'হ্যাঁ ট্যাঁড়স, সব্বাই। তবে বেশির ভাগই না জেনে। কিছু আবার জেনে বুঝে।'

'তুমি ট্যাঁড়স বললে কেন? আমার নাম পটল। ভালো নাম প্রদীপ।'

'ট্যাঁড়স আর পটল দুটোই তো গ্রীষ্মের সব্জী। আমার কাছে তাই এরা এক।'

'তাহলেও তুমি ট্যাঁড়স বলবে না আমায়। ও নাম আমার বিশ্রী লাগে।'

'ঠিক আছে। এখন যে কথা বলছিলাম। মানুষ যখন সভ্য ছিল না, বর্বর ছিল, তখনও সে আমাকে পীড়ন করেছে। গাছ কেটে, জঙ্গল সাফ করে নতুন বসতি করে, চাষের জমি তৈরি করে সে আমার ক্ষতি করেছে। কিন্তু তখন আমার ক্ষতি বেশি হয়নি। কারণ সে ক্ষতি আমি পূরণ করতে পারতাম পৃথিবীর অন্য জায়গায় আরো অরণ্য সৃষ্টি করে। তাছাড়া মানুষ তখন আজকের মতো এত লোভী আর স্বার্থপর হয়ে ওঠেনি। তাই আমার গায়ে মানুষের পীড়ন কোনো আঁচড় কাটত না।'

পটলের মনে পড়ে পরিবেশ নিয়ে দেবব্রত স্যার একদিন ক্লাশে কি সব বলেছিলেন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নিয়ে আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি। একজন মানুষ নাকি রোজ দু পাউন্ডের মতো এই গ্যাস ছাড়ে। গাছ এই কার্বন-ডাই-

অক্সাইড গ্রহণ করে সূর্যের আলোয় তার পাতায় বিশ্লিষ্ট করে। তারপর কার্বন নিয়ে অক্সিজেনকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। জীব আর উদ্ভিদ অলক্ষ্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর পরিবেশে সমতা আনে। তাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু এখন লক্ষ লক্ষ কলকারখানায়, কোটি কোটি মটর, বাস, লরী, টেম্পো, বিমান আর অন্যান্য যানবাহনে, উনুনের ধোঁয়ায়, হাজার হাজার কোটি টন কাঠ, কয়লা, পেট্রল, ডিজেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে মানুষ বাতাসের বুক ভরে দিচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে। বাতাসে যত এই গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে তত মানুষের বিপদ বাড়ছে। মানুষের জীবন অক্সিজেন ভাঁড়ারে টান পড়ছে। ওদিকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। বিপদ আরো বাড়ছে কারণ মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে গাছ তত কমছে। প্রতি বছর কয়েক কোটি একর অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। দেবব্রত স্যার ওদের বলেছিলেন–দেখো, একটা গাছ কাটার আগে অন্ততঃ দুটো নতুন গাছকে যেন বাঁচানো যায়। দেবব্রত স্যারের কথা মনে পড়ায় পটলের মাথাটা নিচু হয়ে যায়।

প্রকৃতি ওর মনের ভাবটা পড়ে নেয়। 'কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকেও অনেক মারাত্মক ক্ষতি কিন্তু মানুষ ও আমার জন্য হয়ে চলেছে।'

সবিস্ময়ে পটল চোখ তুলে চায়। 'আরও বড় ক্ষতি! কী ক্ষতি প্রকৃতি দিদি?'

'তুমি জানো পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে সূর্যের আলোর একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবী একটা ঠান্ডা বরফের গ্রহ হয়েই থাকত। জীব সৃষ্টি হতো না। কিন্তু সূর্য-রশ্মির সবটুকুই ভালো নয়। এর অতি-বেগুনি, অবলোহিত প্রভৃতি রশ্মিগুলো জৈবিক পরিবেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।'

'কই কিছু ক্ষতি তো দেখি না।' সরলভাবে পটল বলে।

'ক্ষতি এখন হচ্ছে না কারণ বায়ুমন্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ধরো ১২ থেকে ৫০ কিলোমিটার উপরে, ওজোনের একটা স্তর পৃথিবীকে রক্ষা করে রয়েছে। এই স্তরে সূর্যের

অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত হচ্ছে। তাই সূর্যালোকের ক্ষতিকর প্রভাব পৃথিবীতে এসে পৌছতে পারছে না।'

'তবে এত চিন্তা কিসের!'

'আছে ট্যাড়স, চিন্তার কারণ আছে।'

'আবার ট্যাড়স বলছ? বলেছি না আমার নাম পটল।'

'ভুল হয়েছে। শোনো পটল, আদিম পৃথিবীতে যখন ওজোনের এই স্তর ছিল না তখন আজকের মতো জৈবিক পরিবেশে এত বৈচিত্র্যও ছিল না। পৃথিবীর বায়ুস্তরে তেমন অক্সিজেনও ছিল না।'

'ওজোন স্তর তাহলে হলো কি করে?'

'আস্তে আস্তে পৃথিবীতে ডাংগা দেখা দিল। তখনও কিন্তু পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও চলছিল। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের নানা জায়গায় ফাটল দেখা দেয়। ওই সব ফাটল দিয়ে প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে আসে। এদিকে বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হতে হতে বাতাসে অল্প অল্প করে অক্সিজেন জমিয়ে তুলছিল। তারপর ধীরে ধীরে বায়ুমন্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে ওজোনের ঢাল গড়ে উঠল। তুমি বলবে এসব পুরনো কথা। ওজোনের ঢাল যখন আছে তখন ভাবনা কী!'

'ঠিকই তো। মিছিমিছি তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ আর মানুষের নামে বদনাম করছ।'

'এবার শোনো ভয়ের কথাটা। মানুষ তার সুখ, আরাম আর সমৃদ্ধির জন্য এমন সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে শুরু করেছে যা তোমাদের সুরক্ষার জন্য তৈরি ওজোনের ঢালটিকে কদর্যভাবে আঘাত হানছে। আঘাত এত বেশি হচ্ছে যে ওজোনের রক্ষাকবচটি দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমনকি ওতে ছিদ্রও দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। এমনি আরো কিছুকাল চললে ওজোনের স্তর ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে অত্যন্ত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি।'

'ওজোনের স্তর কত পুরু, প্রকৃতিদি?'

'বায়ুমন্ডলে ওজোনের পরিমাণ খুবই কম বলা যায়। প্রতি ১০ লক্ষ ভাগে ওজোন হলো ১০ ভাগেরও কম। তাই বুঝতেই পারছ এর স্তর খুব পুরু হয়নি।'

পটলকে এবার শংকিত লাগে। উদ্বিগ্নভাবে সে জিজ্ঞাসা করে, 'প্রকৃতিদি, কি করে ওজোনের স্তরে আঘাত লাগছে?'

'ওজোনের প্রধান শত্রু হলো ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বন (সি. এফ. সি.)। ওজোনকে সরাসরি মারাত্মক আঘাত হানছে সে। ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের মধ্যে আবার প্রধান হলো ক্লোরিন। ক্লোরিনকে মানুষ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করছে প্রশীতক হিসাবে হিমায়কে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এবং ইনসুলেসনে। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন আরো ব্যবহৃত হয় এয়ারোসোল ক্যান তৈরিতে, ফোম প্ল্যাস্টিক জিনিসপত্রে, ইলেকট্রনিক সার্কিট বোর্ড এবং কম্পুটার চিপ পরিষ্কার করার দ্রাবক হিসাবে। এ ছাড়াও ক্লোরিন আছে ডি. ডি. টি., ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদিতে।

'ওজোনের আর এক শত্রু হলো নাইট্রিক অক্সাইড। গাড়ি ঘোড়ার ইঞ্জিন থেকে যে ধোঁয়া বার হচ্ছে তার থেকে বাতাসে মিশছে নাইট্রিক অক্সাইড। যত দিন যাচ্ছে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে দূষণের মাত্রাও। এরা সবাই কিন্তু বাতাসে মিশে স্থির হয়ে থাকছে না বা স্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ বৃষ্টির জলের সংগে মাটিতে নেমে আসছে না। ঊর্ধ্ব বায়ুমন্ডলে এরা গিয়ে আঘাত হানছে ওজোনের স্তরকে।'

'ক্লোরিন ও নাইট্রিক অক্সাইডের মধ্যে ওজোনকে কে বেশি আঘাত হানছে, প্রকৃতিদি?'

'অবশ্যই ক্লোরিন। নাইট্রিক অক্সাইড ওজোনের স্তরকে যতটা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় তার থেকে ৬ গুণ বেশি বিপর্যয় আনে ক্লোরিন। তাছাড়া বায়ুমন্ডলে

নাইট্রিক অক্সাইড টিকে থাকে ১৮০ বছর পর্যন্ত। কিন্তু ক্লোরিন থাকে ৪০০ বছর ধরে।'

পটলের মনে পড়ে সে তার বিজ্ঞান বইতে ওজোন সম্বন্ধে কিছু পড়েছিল। ওজোন হলো আসলে জমাট বাঁধা অক্সিজেন। তার মানে একটা ওজোনের অণুতে (molecule) তিনটে অক্সিজেনের পরমাণু (atom) থাকে। রাসায়নিক পরিভাষায় ওজোনকে লেখে (O_3)। তার মানে মানুষ যা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেয় সেই অক্সিজেনের (O_2) অণুর সঙ্গে আর একটা অক্সিজেন পরমাণু মিলে গিয়ে ওজোন সৃষ্টি করে। ওজোনের পরিমাণ বাতাসে খুব কম। যেটুকু আছে তা জমাট বেঁধে আছে ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে। কিন্তু ওজোন কি করে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে প্রতিহত করে তা পটল জানে না। তাই সে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা প্রকৃতিদি, ওজোন কি করে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে আটকায়?'

'তোমাকে তো বলেছি পটল, ওজোনের স্তর সারা পৃথিবীর মাথার উপর ছাতার মতো আছে। যখনি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ওজোন স্তরে এসে ধাক্কা মারে তখন ওজোনের অণু ভেঙে যায়। ওজোন নিজে ভেঙে গিয়ে জীবের পক্ষে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির যাবতীয় শক্তিকে নিরাপদ উত্তাপে পরিণত করে। তারপর সেই উত্তাপকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। ফলে অনিষ্টকর অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না।'

প্রকৃতির কথা শেষ হতেই পটল জানতে চায়, 'তুমি তো বললে অতিবেগুনি রশ্মির ধাক্কায় ওজোনের অণু ভেঙে যায়। ভেঙে গিয়ে কি হয়?'

'ওজোন ভেঙে একটি অক্সিজেন অণু (O_2) ও একটি অক্সিজেন পরমাণুতে (O) পরিণত হয়। অক্সিজেনের এই অণু ও পরমাণু একটি চক্রে ঘুরতে ঘুরতে আবার মিলিত হয় এবং আবার একটি নতুন ওজোন (O_3) অণুতে পরিণত হয়।'

'তবে ক্লোরিন বা শিল্পে ব্যবহৃত অন্য কোনো ক্লোরোফ্লুরোকার্বন কিভাবে ওজোনকে ধ্বংস করছে?'

'শোনো পটল, ক্লোরিন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে যাবার পর বৃষ্টিপাত বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে পৃথিবীতে নেমে আসে না। একবার মুক্ত হলে এরা ভাসতে ভাসতে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে পৌঁছে যায় মুক্তির দশ বছরের মধ্যেই। সেই অবস্থায় যদি সূর্যের কোনো অতিবেগুনি রশ্মি ক্লোরিন বা অন্য কোনো ক্লোরোফ্লুরোকার্বন অণুকে আঘাত করে তখন সেই গ্যাস থেকে ক্লোরিন পরমাণু (Cl) মুক্ত হয়ে যায়। মুক্ত এই ক্লোরিন পরমাণু অনুঘোটকী বিক্রিয়ায় ওজোন অণুকে আক্রমণ করে বসে। ওজোন অণু ক্লোরিনের এই আক্রমণে একটি অক্সিজেন অণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুতে ভেঙে যায়। ক্লোরিন পরমাণু মুক্ত অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্লোরিন মনোক্সাইড (ClO) উৎপন্ন করে। ক্লোরিন মনোক্সাইডের থেকে অক্সিজেন পরমাণু পরে আলাদা হয়ে গিয়ে আর একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে একদিকে সাধারণ অক্সিজেন (O_2) তৈরি হয়, অন্যদিকে ক্লোরিন পরমাণু মুক্ত হয়ে যায়। অক্ষত এই ক্লোরিন পরমাণু আবার ওজোনকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়। এমনি করেই ক্লোরিনের পরমাণু ওজোনের অণুকে বিধ্বস্ত করে চলে। একটা ক্লোরিন পরমাণু সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হবার আগে ১ লক্ষ বার পর্যন্ত ওজোন অণুকে তছনছ করে দিয়ে যেতে পারে। তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে বাতাসে যত ক্লোরিন বাড়বে তত বেশি পৃথিবীর মানুষ এবং জীব বিপদে পড়বে।'

পটলের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠতে থাকে। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা প্রকৃতিদি, ওজোন স্তর বিনষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কি ধরনের বিপদে পড়বে?'

'সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি জলে ও স্থলে অনেক উপকারী প্রাণী ও উদ্ভিদকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাছাড়া নানাভাবে এই রশ্মি সমুদ্রে ও ডাঙায় বহু উদ্ভিদের জীবনচক্রে প্রভাব ফেলবে। অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রারি এবং দীর্ঘ তরঙ্গগুলো মারাত্মক চামড়ার ক্যানসার ঘটায়। তাছাড়া চোখের ছানি রোগেও এই তরঙ্গগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। আবার এরা চামড়ার রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে বহু রোগাক্রমণের রাস্তা খুলে দিতে পারে। আমেরিকার একটি পরিবেশ রক্ষণ সংস্থা 'দি এনভিরনমেন্টাল প্রোটেকসন এজেন্সি' ১৯৮৭ সালে ঘোষণা করেছে যে পৃথিবীতে শতকরা এক ভাগ ওজোন কমার অর্থ হবে চামড়ার ক্যানসার রোগের শতকরা এক থেকে তিন ভাগ বৃদ্ধি। তাদের হিসাব মতো গত দশকে অন্ততঃ শতকরা দুভাগ ওজোন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরিণামে সম্ভবত ৪০ লক্ষ লোক চামড়ার ক্যানসার রোগের শিকার হয়েছে। এর অর্থ হলো ঐ দশকে ক্যানসার জনিত চর্মরোগের শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি। চিকিৎসকরা মনে করছেন এর পরের দশকগুলোতে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এবং শতকরা হার আরো অনেক বেড়ে যাবে।'

'আচ্ছা প্রকৃতিদি,' পটল একটু ইতস্তত করে বলে, 'ক্লোরিন যে ওজোন স্তরের এত ক্ষতি করছে তাকি মানুষ বুঝতে পারছে না? আর যদি সত্যিই ইতিমধ্যে এই স্তরের ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে কতটা ক্ষতি হয়েছে।'

'হ্যাঁ পটল, মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে ক্লোরিন ওজোন স্তরের কত ক্ষতি করছে। এটুকুই যা আশার কথা। অবশ্য ১৯৮০ সালের আগে পৃথিবীতে ওজোন স্তরের ক্ষতির কথা নিয়ে খুব কম লোকই মাথা ঘামাত। কিন্তু ১৯৮৫ সালে বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যখন তারা বৃটিশ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে জানতে পারল যে পৃথিবীর রক্ষাকবচ ওজোন স্তর বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তর এত পাতলা হয়ে গেছে যে সেখানে একটা বড় গর্ত দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর আগে ১৯৭৪ সালে শেরউড রোল্যান্ড (F. Sherwood Rowland) এবং মেরিও মোলিনা (Mario J. Molina) নামে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত দুই বিজ্ঞানী মানুষের তৈরি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ওজোন স্তরের ধ্বংসের সম্ভাবনার কথা আগাম জানিয়েছিলেন। এই দুজন বিজ্ঞানী বিশেষ করে রেফ্রিজারেটর ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরোকার্বন সম্বন্ধেই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন।'

'তারপর কি হলো প্রকৃতিদি?'

'বৃটিশ বিজ্ঞানীদের খবরের ভিত্তিতে আমেরিকার অগ্রণী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

নাসা (NASA), নোয়া (National Oceanic and Atmospheric Administration) এবং জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা (National Science Foundation) এ ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০,০০০ ফুট উপরে উড়তে পারে এমন একটি ই. আর. ২ (ER-2) বিমান এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা একটি ডি. সি. ৮ জেট বিমান ১৯৮৭-র শীতে এ্যান্টার্টিকা অভিযান চালায়। এরা যে তথ্য সংগ্রহ করল তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন যে দক্ষিণ মেরুর উপরকার ওজোন স্তরে সত্যিই গর্ত হয়েছে। এখানে ওজোন স্তর পঞ্চাশ ভাগ মতো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। আরো জানা গেল এই ক্ষয় সীমিত ধরনের। মেরুদেশের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই এই ক্ষয় ধরা পড়েছে। ওজোনের এই ক্ষয়প্রাপ্তি কোথাও প্রাকৃতিক কারণে হয়নি। এটা ঘটেছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে। বিজ্ঞানীদের মনে হলো এই বিক্রিয়া শীত শেষের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে ওঠা পাতলা বরফের মেঘের উপস্থিতিতে ঘটেছে। অর্থাৎ সূর্যের তাপ মেরুপ্রদেশে পড়বার ঠিক আগেই এটা ঘটেছে।'

'প্রকৃতিদি, উত্তর গোলার্ধে, অর্থাৎ পৃথিবীর যেদিকে আমরা থাকি তার কি অবস্থা?'

'দক্ষিণ গোলার্ধের ওজোন স্তরের অবস্থা জানবার পর স্বভাবতঃই উত্তর গোলার্ধের অবস্থা জানার ব্যাপারেও বিজ্ঞানীদের কৌতূহল হয়। উত্তরের জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়াতে ওজোন স্তরের ফাটল এই গোলার্ধে অধিকতর ক্ষতি ঘটাবে বলে আশংকা হয়। কুমেরুতে অভিযান চালিয়েছিলেন যে আবহ বিজ্ঞানী ও কম্পুটার বিশেষজ্ঞরা, তাঁরাই সুমেরুর উপর ওজোন স্তরের অবস্থা পর্যালোচনা করতে ১৯৮৯-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় ৪৫ দিন ধরে অনুসন্ধান চালান। এই অনুসন্ধানকাজেও দক্ষিণ মেরু গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বিমান দুটিও লাগানো হয়। এরা উত্তর মেরুর আকাশে ২৮টি অভিযান চালিয়ে সেখানকার বাতাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। এই সব সংগৃহীত তথ্য এক বছর ধরে বিচার বিশ্লেষণ করে ১৯৯০-এর মার্চে বিজ্ঞানীরা অভিমত দেন যে উত্তর মেরুর বায়ুস্তরেও একই ধরনের ঘূর্ণাবর্ত এবং বরফ মেঘ দেখা দিয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্ত এবং বরফ মেঘ দক্ষিণ মেরুর মতো অতটা ব্যাপক না হলেও এটা প্রমাণিত হয় যে উত্তর মেরুর বায়ুস্তরেও ওজোন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই ক্ষতির পরিমাণ কোনো কোনো উচ্চতায় শতকরা ১৫ থেকে ১৭ ভাগ।'

'আচ্ছা প্রকৃতিদি, সৃষ্টির এতবড় বিপদের কথা মানুষ জানতে পেরেও নিশ্চেষ্ট আছে কিভাবে? বিপদ এড়াবার জন্য কিছুই কি করা হচ্ছে না?'

'মানুষ বসে আছে বলব না। ওজোন স্তরে ফাটলের কথা এবং ওজোন স্তর ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতির কথা মানুষ বুঝতে পারার সংগে সংগেই কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৮৭-র মন্ট্রিল সিদ্ধান্ত। কানাডার এই শহরে বিশ্বের ৪০টির বেশি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে ১৯৯৮ সালের মধ্যে তারা তাদের ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের উৎপাদন অর্ধেক কমিয়ে দেবে। এই দেশগুলিরই ১৯৯০ জুনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথিবীর সব দেশ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাদের ক্লোরোফ্লুরোকার্বন উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্য কম উন্নত দেশগুলোতে ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য আরো দশ বছর বেশি সময় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২০১০ সালের মধ্যে এই দেশগুলো ক্লোরোফ্লুরোকার্বন তৈরি বন্ধ করে দেবে।

'তবে বিজ্ঞান গবেষকদের অভিমত হলো আজ যদি সারা পৃথিবীতে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন উৎপাদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় তবুও যে পরিমাণ ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (সি. এফ. সি) উৎপাদিত হয়ে আবহমণ্ডলে যাবার জন্য প্রস্তুত আছে তারা বহু দশক ধরে ওজোন স্তরের ক্ষতি করেই চলবে। শুধু বাতিল হিমায়ক এবং বায়ু-তাপ নিয়ন্ত্রকগুলো থেকেই লক্ষ লক্ষ টন ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে বিপর্যস্ত করবার জন্য মুক্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া ক্লোরোফ্লুরোকার্বন উৎপাদন সারা বিশ্বে অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এটা আশা করাও কঠিন। তাই আগামী অনেকগুলো দশকে ওজোন স্তরের উপর নিদারুণ আক্রমণ চালিয়ে যাবে মানুষের হাতে গড়া ফ্রাংকেনস্টাইন ক্লোরোফ্লুরোকার্বন। কয়েক প্রজন্মের মধ্যে দুর্দিন অবসানের সম্ভাবনা নেই। তবে আশার বাণী একটাই। মানুষ পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠছে। এই সচেতনতা যত দ্রুত বাড়বে এবং ব্যাপক হবে তত তাড়াতাড়ি ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য পৃথিবীর বিপদমুক্তি ঘটবে।'

'আমি এখন কি করব, প্রকৃতিদি, এই বিপদ এড়াতে?'

'তুমি তোমার বন্ধুদের, স্কুলের ছেলেদের, শিক্ষকদের, বাড়ির আর গাঁয়ের লোকেদের সব কথা খুলে বল। সবাই পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে একজোট হও। আর হ্যাঁ, পড়াশোনা ভালো করে করবে। যত পড়বে তত পরিবেশের কথা ভালো করে জানবে।'

'কিন্তু দিদি, আমার যে একটা অংকও মিলল না। অংক করতে তাই আমার ভালো লাগে না।'

'আবার করো। ঠিক হবে।'

অংকর কথায় পটলের চৈতন্য হয়। তাইতো, এখনও যে হোমটাস্কের কিছুই হলো না। গ্রীষ্মের ছুটি এদিকে ফুরিয়ে এল।

'প্রকৃতিদি, অংক ঠিক হওয়ার একটা সোজা উপায় বলে দাও। প্রকৃতিদি, প্রকৃতি দিদি....

কোথায় প্রকৃতি! সিঁদুরে আমের মতো রঙের সুন্দরী প্রকৃতি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। পটল চারদিকে খোঁজে। খুঁজতে গিয়ে একটা গাছে ধাক্কা খায়। বড্ড লেগেছে! ওঃ! পটলের সম্বিত ফিরে আসে। চোখ মেলে সে দেখতে পায় একরাশ বই খাতার উপর সে শুয়ে আছে।

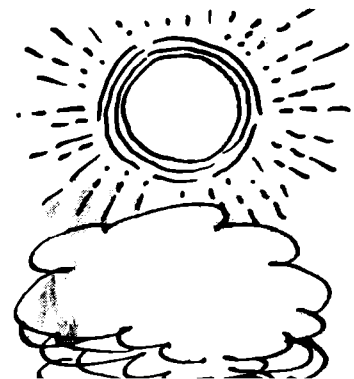

ভবানী দত্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

তমালের মা

কিংশুক বসু

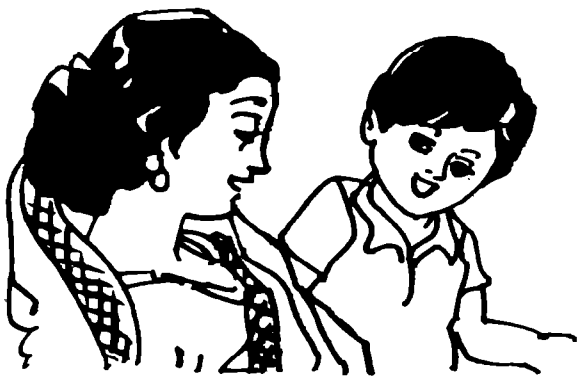

বিছানায় শুয়ে কেবলই ছটফট করছিল তমাল। কাল তালডাঙা স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে তপন মেমোরিয়াল শিল্ডের ফাইনাল খেলা। কুনালদা বলেছে, কাল তোকে গোল করতেই হবে। উত্তেজনায় ঘুম আসছে না তমালের চোখে। কেবলই এপাশ ওপাশ করছে। রাতে একবার মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, এ কী রে, তুই এখনও ঘুমোসনি!

তমাল মায়ের গলা জড়িয়ে বলল, মা, আমার জার্সিটায় বড় করে একটা 10 লিখে দেবে? জানো তো, পেলে, মারাদোনা, গুল্লিট সবার জার্সির নম্বরই 10। মা হেসে বললেন–সে দেখখন, এখন ঘুমো তো পাগল ছেলে।

পরের দিন সকাল থেকেই গাঁয়ে সাজ সাজ রব, রঙিন কাগজ দিয়ে সারা গাঁ সাজানো হয়েছে। খেলা শুরুর এক ঘণ্টা আগেই মাঠ যেন উপচে পড়ছে। প্রথমার্ধে কোনো দলই গোল করতে পারল না। খেলা শেষ হতে আর দশ মিনিট বাকি। তখনও ফলাফল গোলশূন্য, হঠাৎ সবাই দেখল তমাল বলটা নিয়ে তীরবেগে তালডাঙা স্পোর্টিং ক্লাবের গোলের দিকে ছুটছে। বাঁ পায়ে সট নিল তমাল। গোলার মতো উড়ে গেল বলটা।

গো-ও-ওল।

আকাশ ফাটানো চিৎকারে তমাল বুঝল গোল হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তমালের দেওয়া গোলেই নবগ্রাম স্পোর্টিং ক্লাব এক গোলে জিতে গেল। দারুণ আনন্দ, দারুণ হৈচৈ। সমর্থকদের আদরের আতিশয্যে তমাল তখন পালাতে পারলে বাঁচে। বাড়ি ফিরে তমাল বলল, জানো মা, তুমি জার্সিটায় 10 লিখে দিতে মনে হচ্ছিল আমি যেন মারাদোনা হয়ে গেছি। ঐ জন্যই তো গোলটা দিতে পারলাম।

মা ওকে বুকে জড়িয়ে বললেন–দুর! তাই কখনও হয় নাকি? তুই ভাল খেলেছিস, তাই গোল দিতে পেরেছিস। এখন ঘুমোবি চল।

শুয়ে শুয়ে তমালের কেবলই তার দেওয়া গোলটার কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, ঘুমিয়ে পড় তমাল। মায়ের গভীর স্নেহের স্পর্শে তমালের চোখে ঘুম নেমে এল। জানালা দিয়ে চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তমালের মুখে। ওকে এখন সত্যিই সুখী দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে তমাল। মা তখনও মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

ভবানী দত্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

মায়ের মমতা

বিশু মিত্র

মাঝরাতে কপালে কোমল স্নেহমমতা মাখা স্পর্শ পেয়ে বিশ্বনাথের ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মমতাময়ী তার মাকে সে দেখতে পাচ্ছে। মায়ের মুখে হাসি লেগে আছে। এমন সুন্দর হাসি শুধু ফুলই হাসতে পারে। স্বর্গীয় সুষমা মাখা সেই অপূর্ব হাসির আলোকছটায় সে অভিভূত।

অবাক বিস্ময়ে বিশ্বনাথ মায়ের মমতা মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, মাগো, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমি অসুখে ভুগছি। রোগশয্যায় শুয়ে তোমাকেই বারবার মনে পড়ে। তোমার মমতামাখা পরিচর্যা, সেবা-শুশ্রূষার তুলনা খুঁজে পাই না মা। তাইতো মনের মধ্যে চাপা দুঃখ পাষাণভারের মতো কণ্ঠরোধ করে দিতে চায়। তুমি যখন

এসেই গেছ আর চলে যাবে না বল।

বিশ্বনাথের মা তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, তোমাকে সারিয়ে তুলতেই তো আমি সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি। আজ তুমি সেরে না উঠলে আগামীকাল পরীক্ষায় বসবে কি করে? লেখাপড়া শিখে তুমি মস্তবড় মানুষ হবে। আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। তোমার মুখ চেয়েই তো আমার যত আশা-আকাঙ্ক্ষা।

মায়ের আগমনে আনন্দে অভিভূত বিশ্বনাথ বলে, জান মা, বাবা নিজের কাজ নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকেন। আমার জন্য কোনো কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। আমার তুমি থাকতে আমি কত নিশ্চিন্ত ছিলাম। তোমার মমতার আশ্রয়ে সব সময় আমার দিন ভরে থাকত। অসুখ হলে সব কাজ ফেলে তুমি আমার বিছানার পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে। ধৈর্য ধরে ওষুধ পথ্য খাওয়াতে। এসব তো বেশিদিন আগের ঘটনা নয়। তখন আমি কত সুখী ছিলাম। সব কাজের মধ্যে তোমার স্পর্শ পেতাম। আজ কেন জানি না সে সব কোথায় হারিয়ে গেছে মনে হয়। তোমার কথা ভেবে ভেবে কান্না পায়, পড়াশুনো করতে মন লাগে না।

মা আশ্বস্ত করে বলেন, এই তো আমি এসেছি তোমার কাছে। আর তো তোমার কোনো চিন্তা রইল না। মন দিয়ে পরীক্ষা দাও। আমি বলছি তুমি খুব ভাল ফল করতে পারবে। কিন্তু ওসব কথা থাক এখন। শোবার সময় ওষুধ পথ্য কিছুই করোনি অভিমান করে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। যাক এখন এগুলো খেয়ে নাও। আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে তুমি দেখবে যে তুমি পুরোপুরি সেরে উঠেছ।

সকালে বাবার ডাকেই বিশ্বনাথের ঘুম ভেঙে যায়।

–কিরে, কাল রাতে নিজের মনে অত কি বকবক করছিলি?

চোখ মেলে প্রথমটা একটু থমকে থাকে বিশ্বনাথ। তারপরই মনে পড়ে যায় রাতের সব কথা। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, জান বাবা, কাল রাতে মা আমার কাছে এসেছিলেন। ওষুধ পথ্য খাইয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন, অসুখ সেরে যাবে। সত্যিই তাই। দেখো বাবা, আমার আর কিছু অসুখ নেই। পরীক্ষাতেও বসতে পারব।

জ্বর আছে কি নেই জানবার জন্য বাবা বিশ্বনাথের কপালে হাত রাখেন। কী আশ্চর্য! এতদিন একনাগাড়ে লেগে থাকা জ্বরের চিহ্নমাত্র নেই। ভোজবাজির মতো কোথায় সব উধাও হয়ে গেছে। তাঁর দুচোখও চিকচিক করে ওঠে। বলেন, তোর মাকে ধরে রাখতে পারলি না? তাহলে তো আর দুঃখকষ্ট থাকত না।

অবুঝের মতো বিশ্বনাথ বলে, মা কখন আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চেলে গেছেন জানতেই পারিনি। নইলে আমি কি যেতে দিতাম? জান বাবা, মা বলে গেছেন আবার আসবেন। এবার এলে আর ছাড়ব না। দেখো, ঠিক ধরে রাখব। আর কোথাও যেতে দেব না।

অনেক কষ্টের মধ্যেও বিশ্বনাথের বাবার মুখে বিষাদমাখা এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। রোগশয্যায় শুয়ে আচ্ছন্নতার ঘোরে ছেলে তার মাকে দেখেছে, কথা বলেছে, সান্ত্বনা পেয়েছে এতেই তিনি খুশি। হোক স্বপ্নের মিথ্যে মায়া তবু তিনি জানেন মনের মধ্যে মায়ের মমতার যে স্বর্গীয় স্পর্শ বিশ্বনাথ পেয়েছে তাতে তার সব হতাশা কেটে যাবে। মায়ের কথা ভেবেই সে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পাবে।

ছবি : সুফি

এঁদের লেখাও ভালো হয়েছে: সৌগত কর/রঘুনাথপুর, মেদিনীপুর ॥ অবিশেষ সাহা/ডোমকল, মুর্শিদাবাদ ॥ শান্তনু বিশ্বাস/খড়দহ, ২৪ পরগনা (উঃ) ॥ মৈত্রেয়ী প্রধান, স্কুল বাজার, মেদিনীপুর ॥ মলয় মুর্মু, কৃষ্ণনগর, ৭৪১১০১ ॥ প্রীতম দে, মাকড়দহ, হাওড়া ॥ কৌশিক বোস, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ॥ সুখেন্দু ঘোষ, কুমীর মোড়া, হুগলী ॥ তাপসী রায়চৌধুরী, রায়না, বর্ধমান ॥ সায়ন্তন রায়, হলদিয়া, মেদিনীপুর ॥ তারক প্রামাণিক, গোলারহাট রোড, বর্ধমান ॥ স্বপনকুমার প্রামাণিক, হানুভঞ্জা, মেদিনীপুর ॥ অনন্যা সাধুখাঁ, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা ॥

ঘোষণা

বর্ধমানের চিত্তরঞ্জন থেকে রবীন্দ্রনাথ বল ও গণেশচন্দ্র বল (রাস্তা নম্বর ২৩, কোয়ার্টার নম্বর ২০/এ) তাঁদের প্রয়াতা মাতা ৺শৈলবালা বলের নামে একটি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে আমরা তাই শৈলবালা বল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য মৌলিক লেখা চাইছি।

৺শৈলবালা বল

বিষয়বস্তু

মধুর আমার মায়ের হাসি

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হবে।

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ মাঘ।

প্রথম পুরস্কার : ৫০ টাকা • দ্বিতীয় পুরস্কার : ৩০ টাকা

নতুন ধাঁধা

১. লেজ নেই মুখ আছে
মধ্যে আছে আকাশ
খুব বেশি কথা বলে
এইটুকু দিই আভাস।

—আশিস চক্রবর্তী
গাঁতি [সারদাপল্লী]
উত্তর ২৪-পরগণা

২. আদি অন্তে প্রাণটি পাব
অন্ত দুইয়ে দৌড়ে যাব
সবে মিলে রঙ ছড়াব।

—নন্দিতা ও অনুমিতা দাশ
কে. টি. পি. পি/মেদিনীপুর

৩. শুরুতেই পানীয়
ফল দিয়ে শেষে
সবে মিলে গল্পে মাতি
এখানেই বসে।

—প্রণবকুমার সেন
মালিয়াড়া
পুরাতন হাটতোলা
বাঁকুড়া

৪. তিন অক্ষরে নাম তার বাচ্চা জন্তু
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে পাখি হবে কিন্তু।

—সুমনা ও পার্থ ব্যানার্জী
গ্রাম + পোঃ অর্ধগ্রাম
বাঁকুড়া

কার্তিক সংখ্যার ধাঁধার উত্তর ঃ ১। পৃথিবী ২। বাদল ৩। সুন্দরবন ৪। পালকি

*** কার্তিক সংখ্যার শব্দমালার উত্তর ঃ**

পাশাপাশি

১। ফিনাইল ৩। ভাবা ৫। তামা ৭। জনসন ৯। দাদুর ১০। আম ১১। নখ ১৩। আরব ১৪। হরীতকী ১৬। সুধা ১৮। কচু ১৯। সালফার

ওপরনিচ

১। ফিটন ২। লতা ৪। বানর ৬। মাদাম কুরী ৭। জল ৮। সত্যেন বসু ১২। চাকী ১৩। আরক ১৫। টগর ১৭। ধাসা

এটি তৈরি করেছেন ঃ
বিভাংশু দত্ত
পল্লীশ্রী/আরামবাগ
হুগলী

নতুন শব্দমালা

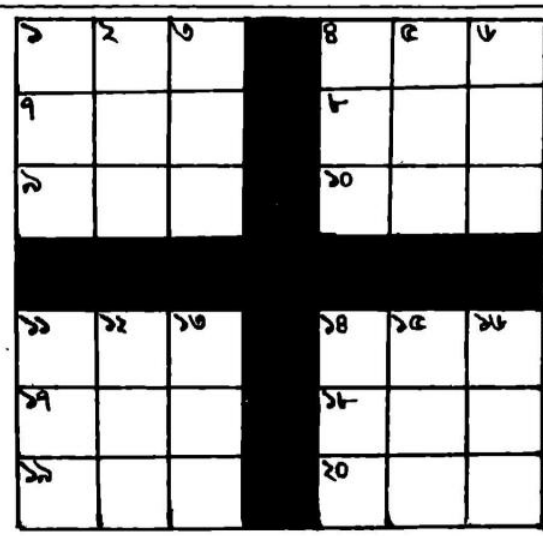

[ডবল মজার শব্দমালা। এবারের নতুন শব্দমালার প্রতিটি উত্তরই তিন অক্ষরের। এ ছাড়া, আমাদের প্রিয় 'শুকতারা'-র যে কোনও একটি অক্ষর (শ্, ক, তা, রা) প্রতিটি উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। দেখ তো, কেমন লাগে এই ডবল মজার শব্দমালা।]

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ

১. অর্থ জানতে কর্ণধার/শুকতারাতেই বর্ণ ধার ?
৪. এ যে নয় অভিষিক্ত/এর নয় অতিরিক্ত
৭. ফলটা চিনা/বুঝলে কি না ?
৮. ফারসির গণনা/সেইটাও জানো না ?
৯. হুঁকোর তামাক এ/বলে দাও আমাকে
১০. এটা সোনা/সবার শোনা
১১. হও সচেতন/লও গো কেতন
১৪. ধরো ধরো রক্ষকে/দেখি ভাষায় দক্ষ কে
১৭. চেঙ্গিজ খাঁ-র সেনা/নামটা জানে কে না
১৮. কেউ বলে ও শস্য/বড়ো ঝুড়ি অবশ্য
১৯. দিলে খিল/হবে মিল
২০. সমুদায়/অর্থ তায়

উপর-নিচ ঃ

১. অবনীন্দ্রের গল্পখান/বুদ্ধদেবে পেলেন স্থান
২. অক্ষম অসমর্থ/এ দুয়ের সম অর্থ
৩. কটকে উৎপন্ন/জামা জুতো হয় পণ্য
৪. সে এক স্তন্যপায়ী/জলাশয়ের জন্য পাই
৫. নয় যদি বাড়ানো/তবে তুমি তা জানো
৬. স্বর্গে কম মন দিও/নরক সম্বন্ধীয়
১১. ধ্বজাধারী/সোজা ভারি
১২. লোহার লাঠি বাগাও/রঙঝাল লাগাও
১৩. মান নয়, ধন নয়/ক্রিয়ার সাথে অন্বয়
১৪. আরবি ভাষায়/খোঁজের আশায়
১৫. বসন ধৌত/করেন ওই তো
১৬. বৃহৎ দন্ত/হয় ভীষণ তো

ভাদ্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

॥ কলকাতা ॥

অরুণিমা ও শীলা মণ্ডল/শুঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা ; ইন্দ্র, আশিস, জুঁই ও পুপুন/নাকতলা ; বিকাশ, বিজন, জোজো, হাউই ও পিংকাই/নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড ;

॥ হাওড়া ॥

সুদীপ, সবুজকলি, সায়ন, মধুবন, অরিত্র, কৃষ্ণকলি, কথাকলি ও অনিমেষ মাজি/নীলমণি মল্লিক লেন ; বাবুন, ফুচি, বোনা, মাম, পম্পু, রাজা,পাপা, বুড়ি ও ভোদাই/দানু বোস লেন ; নির্মলেন্দু ঘোষ ও রমেশচন্দ্র দত্ত /বারুইপাড়া, ডোমজুড় ; কৃষ্ণা, অপর্ণা, প্রদীপ, কাবেরী, কেদার ও পঙ্কজ/মধুসূদন বিশ্বাস লেন ;

॥ ২৪-পরগণা ॥

বরুণ ও ভাস্কর দাশশর্মা/সিংহীবাগান, মণিরামপুর, ব্যারাকপুর ; দীপ্তি ও শিখা বিশ্বাস/বৈকণ্ঠপুর, সোনারপুর ;

॥ হুগলী ॥

সপ্তর্ষি ব্যানার্জী/বেলমুড়ি ; মুনাই, মোম, মন্টি, দেবশ্রী, সমি, বুবাই ও পুপাই/১১ নং রেলগেট, বৈদ্যবাটী ;

॥ মেদিনীপুর ॥

প্রণব, নন্দিতা ও অনুমিতা/কে.টি.পি.পি ; সুপ্তি ও স্বর্ণেন্দু নায়ক/গড়বেতা ; সৌরভ, পৌলমি, শিবাজী, তাপস ও শ্রীধর/কাগুরিয়াবাড়ি, কিসমত বাজকুল ;

॥ বর্ধমান ॥

জয়িতা নায়ক/মণিমালা গার্লস হাইস্কুল , আসানসোল ; সুমেধা, সুশ্বেতা, দেবশ্রুতি, ঋতুপর্ণ ও পামেলা/বার্ণপুর ; মিলি ও মাম/হিলভিউ, আসানসোল ;

॥ বাঁকুড়া ॥

তিন্নি ও মুন্নি দত্ত/কলেজ পাড়া, বিষ্ণুপুর ; মিল্টন, কল্লোল, মৌসুমী, অষ্টমী, বুবাই, পার্থ, টুসী ও শুভ্রাংশু/মনোহর, মালিয়াড়া ;

॥ পুরুলিয়া ॥

তুষারকান্তি, তুহীনকান্তি ও কৃষ্ণেন্দু বিকাশ/কুকস্ কম্পাউন্ড, নিউ কলোনী ; অরূপ ও অতনু সিংহ/কুকস্ কম্পাউন্ড ;

॥ বিহার ॥

মৌ, শেলী ও দোলা পাল/বোকারো স্টিল সিটি ; জুঁই ও বাবলি নন্দন/দেওঘর; বাবু ও মিঠু ঘোষ রায়/মৌভাণ্ডার, সিংভূম ;

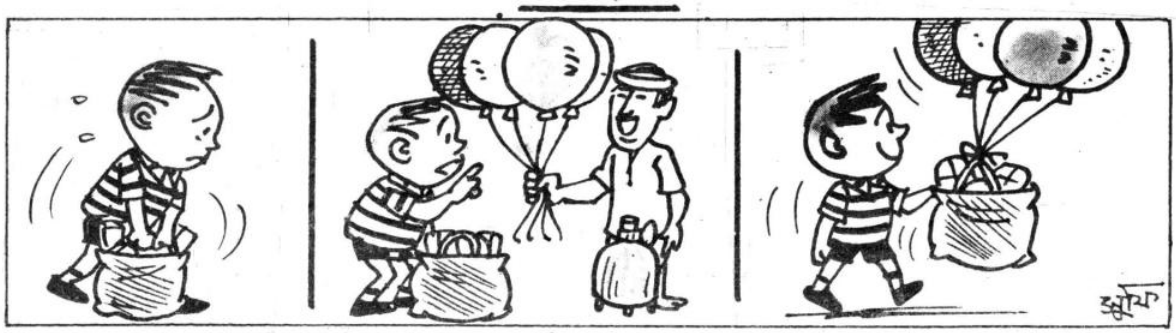

ভাঙা কেবিনের ভূত

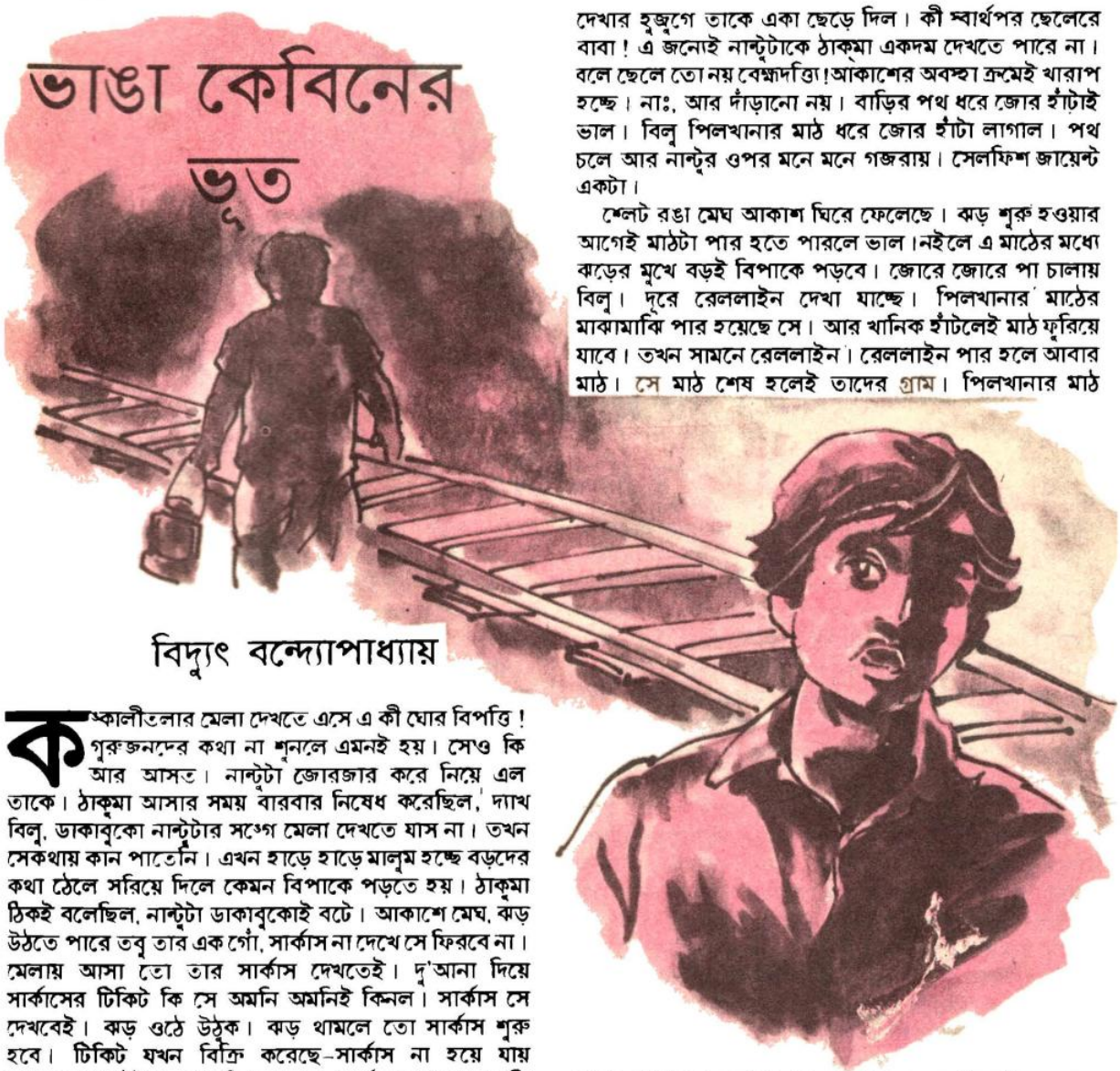

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কঙ্কালীতলার মেলা দেখতে এসে এ কী ঘোর বিপত্তি! গুরুজনদের কথা না শুনলে এমনই হয়। সেও কি আর আসত। নান্টুটা জোরজার করে নিয়ে এল তাকে। ঠাকুমা আসার সময় বারবার নিষেধ করেছিল, দ্যাখ বিলু, ডাকাবুকো নান্টুটার সঙ্গে মেলা দেখতে যাস না। তখন সেকথায় কান পাতেনি। এখন হাড়ে হাড়ে মালুম হচ্ছে বড়দের কথা ঠেলে সরিয়ে দিলে কেমন বিপাকে পড়তে হয়। ঠাকুমা ঠিকই বলেছিল, নান্টুটা ডাকাবুকোই বটে। আকাশে মেঘ, ঝড় উঠতে পারে তবু তার এক গোঁ, সার্কাস না দেখে সে ফিরবে না। মেলায় আসা তো তার সার্কাস দেখতেই। দু'আনা দিয়ে সার্কাসের টিকিট কি সে অমনি অমনিই কিনল। সার্কাস সে দেখবেই। ঝড় ওঠে উঠুক। ঝড় থামলে তো সার্কাস শুরু হবে। টিকিট যখন বিক্রি করেছে–সার্কাস না হয়ে যায় কোথায়! নান্টুটা ঘাড় নাড়িয়ে বলল, সার্কাস না দেখে আমি যাচ্ছি না। তোমার খুশি হয় তুমি চলে যাও। মাঠ পার হলেই রেললাইন। রেললাইন পার হলেই আবার মাঠ। সে মাঠ শেষ হলেই গ্রাম। এত বড় ছেলে একা যেতে পারবি না? যা যা যাবি তো চলে যা। ঝড় উঠল বলে।

অগত্যা একাই বিলুকে বাড়ির পথ ধরতে হলো। মেলার মাঠে ঘুরতে ঘুরতে আকাশের গতিক টেরই পায়নি। আকাশের অবস্থা সত্যিই খারাপ। ঝড় উঠল বলে। আকাশ যা বাহারি সেজেছে, একটা প্রলয় ঝড় না উঠিয়ে ছাড়বে না। নান্টুর ওপর মনে মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিল বিলুর। তার পাল্লায় পড়েই কঙ্কালীতলার মেলা দেখতে আসা। এখন সে সার্কাস দেখার হুজুগে তাকে একা ছেড়ে দিল। কী স্বার্থপর ছেলেরে বাবা! এ জন্যেই নান্টুটাকে ঠাকুমা একদম দেখতে পারে না। বলে ছেলে তো নয় বেহ্মদত্যি! আকাশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। নাঃ, আর দাঁড়ানো নয়। বাড়ির পথ ধরে জোর হাঁটাই ভাল। বিলু পিলখানার মাঠ ধরে জোর হাঁটা লাগাল। পথ চলে আর নান্টুর ওপর মনে মনে গজরায়। সেলফিশ জায়েন্ট একটা।

শ্লেট রঙা মেঘ আকাশ ঘিরে ফেলেছে। ঝড় শুরু হওয়ার আগেই মাঠটা পার হতে পারলে ভাল। নইলে এ মাঠের মধ্যে ঝড়ের মুখে বড়ই বিপাকে পড়বে। জোরে জোরে পা চালায় বিলু। দূরে রেললাইন দেখা যাচ্ছে। পিলখানার মাঠের মাঝামাঝি পার হয়েছে সে। আর খানিক হাঁটলেই মাঠ ফুরিয়ে যাবে। তখন সামনে রেললাইন। রেললাইন পার হলে আবার মাঠ। সে মাঠ শেষ হলেই তাদের গ্রাম। পিলখানার মাঠ ফুরোতে না ফুরোতেই ঝড় শুরু হয়ে গেল। রাশি রাশি শুকনো পাতা উড়িয়ে ধুলোর মেঘ সারা মাঠ ঘিরে ফেলল। বিলু হাঁটবে কি! এক পা এগোলে ঝড়ের ঝাপট তাকে তিন পা পিছিয়ে দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলোর ঝাপটা লাগছে চোখে মুখে। সে তাকাতেই পারছে না। ভীষণভাবে ঝোড়ো হাওয়ায় দুলছে দূরের গাছপালাগুলো। ঝড় ঠেলেই বিলু হাঁটতে লাগল। এ ধু-ধু মাঠে সে দাঁড়ায় কোথায়! এর ওপর বৃষ্টি নামলে তো আরও বিপত্তি।

বলতে বলতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। মাটিতে কয়েক ফোঁটা পড়তেই কেমন সোঁদা গন্ধ। বিলুর এ সুবাস বড় ভাল লাগে। পড়ি কি মরি হেঁটে সে রেললাইনের ধারে

কী বীভৎস মুখের চেহারা।

পৌঁছল। ততক্ষণে দাপটে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রেললাইন পার হলেও তো আর একটা মাঠ। তা-ও তো কম পথ না! যেমন তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে, আর যা ঝোড়ো হাওয়া তার সঙ্গে—হাঁটাই মুশকিল। তার মধ্যে গুড় গুড় শব্দে মেঘের ডাক! বাজ পড়তে পারে। এ সময় খোলা মাঠের মধ্যে থাকা ঠিক নয়। রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে বিলু চারপাশে তাকায়। খানিকটা দূরে রেললাইনের ধারে একটা ভাঙা কেবিন ঘর। এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাঁটা যাবে না। ঐ ভাঙা কেবিনেই আপাতত আশ্রয় নিতে হবে। এছাড়া আর উপায় কি! বিলু কেবিন ঘরের দিকে পা চালায়।

ওরে বাবা! পেল্লায় কেউটে একটা! লাইন পার হয়ে ওপাশে চলে গেল। বৃষ্টির জল পড়তেই স্ফূর্তিতে বেরিয়ে পড়েছে। অন্ধকার হয়ে আসছে এবার। আচমকা সাপটার সামনে পড়লে আর রক্ষে ছিল না। কেবিন ঘরের পিছন থেকে হুশ করে দুটো শেয়াল বেরিয়ে মাঠের দিকে ছুট লাগাল। কেবিন ঘরের দরজা জানালা নেই। তবে কাঠের সিঁড়িটা আছে। ওপরে ওঠা যাবে। উঠবে বিলু! কতকালের পুরনো সিঁড়ি। যদি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। কিন্তু এখন উপায়ই বা কি? যা থাকে বরাতে বিলু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। নাঃ, সিঁড়িটা মজবুত আছে এখনও। উপরে উঠে বিলু খানিক নিশ্চিন্ত হলো। যাক বাবা আপাতত বৃষ্টির হাত থেকে তো বাঁচা গেল। বৃষ্টি থামলে পরের কথা ভাবা যাবে।

ততক্ষণে চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে। বিলুর কাছে আলো বলতে কিছু নেই। মেলা দেখতে আসার সময় যদি বুদ্ধি করে ছোটকাকার টর্চলাইটটা সঙ্গে নিত! কেবিন ঘরটার ভেতর কেমন ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ছাদের পলেস্তারা খসে মাটিতে ডাঁই হয়ে আছে। আবছা অন্ধকারে বিলু চারপাশে চোখ চালিয়ে দেখল। কুড়-কুড় কড়াৎ! কোথায় যেন বাজ পড়ল। আলো ঝলসে উঠল সারা মাঠময়! বৃষ্টিটা এখন জাঁকিয়ে নেমেছে। কখন থামবে কে জানে। এই অন্ধকার মাঠ ভেঙে সে একা বাড়ি ফিরবে কেমন করে। আজ বাড়ি ফিরলে কপালে উত্তর-মধ্যম ভালোমতই লেখা আছে। ওই নান্টুটার জন্যেই বিলুর এই বিপাকে পড়া। বিলু মনে মনে ঠিক করল নান্টুটার সঙ্গে আর সে কোনোদিন কোথাও যাবে না। বাড়িতে মা ঠাকুমা নিশ্চয় এতক্ষণে অস্থির হয়ে পড়েছে তার জন্য!

বৃষ্টিটা বোধহয় ধরল খানিক। গাছপাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দের তোড়টা একটু কম মনে হচ্ছে। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ না! কেউ ওপরে আসছে? না নেমে যাচ্ছে? নেমে যাবে কে! ওপরে তো কেউ ছিল না। এসে পর্যন্ত সে তো কাউকেই দেখেনি। আর ঘর থেকে সিঁড়ির দিকে যেতেও দেখেনি কাউকে। তবে কি কেউ ওপরে উঠে আসছে! পোড়ো বাড়ি চোর ডাকাতের আড্ডা হয়। ডেরা হয় বদমাইশ লোকজনের। সে অনেক গোয়েন্দা কাহিনীতে এমন সব কথা শুনেছে। এটাও কি তেমন কোনো আড্ডা! বিলু কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে এল এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে এখনও। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছে সে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে একজন কেউ। হাতে ধরা রেলের লণ্ঠন। পয়েন্টসম্যানদের হাতে যেমন থাকে। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে রেল লাইনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার হাতে ধরা লণ্ঠনটা দুলছে চলার তালে তালে। দূরে সিগন্যালের বাতি জ্বলছে যেন এক চোখো ভূত।

লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, অথচ ওপরে তো কাউকে দেখেনি বিলু। লোকটা এলো কোথা থেকে? আশ্চর্য ব্যাপার তো! ভাবতে ভাবতে বিলু সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। এমন সময় ট্রেনের হুইশিল আর সার্চ লাইটের তীব্র আলো। ট্রেন ছুটে আসছে। অথচ বিলু দেখল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা মানুষটা হাতে লণ্ঠন নিয়ে নির্বিকার রেল লাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছে। পিছনে ট্রেন আসছে কোনো হুঁশই নেই। লাইনের ধার ঘেঁষে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে। ইস! ট্রেনটা একদম কাছে এসে পড়েছে। লোকটাকে দেখেই বোধহয় হুইশিল দিচ্ছে।

ইঞ্জিনের জোরালো আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানুষটার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তেমনই হেঁটে যাচ্ছে! বিলু চিৎকার করে ওঠে—ট্রেন! সরে যাও! অনেক দূরে মানুষটা, বিলুর গলা সেখানে পৌছানোর কথা নয়। এই মরেচে! জোরালো আলো আর হুইশলের শব্দে লোকটা মনে হয় হকচকিয়ে লাইনের ওপর উঠে পড়েছে। লাইনের মাঝখানে মানুষটা। ট্রেনটা প্রায় তাকে ছুঁয়ে ফেলল। বিলু চোখ বন্ধ করলো। ট্রেনের শব্দ, হুইশিলের শব্দ আর্তনাদ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। লাইন দাপিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। পিছনের লাল আলোটা দেখা গেল কিছুক্ষণ। তারপর সব চুপচাপ। বৃষ্টি পড়ার শব্দও এখন নেই।

এখন কী করা যায়। বিলু কি বাড়ির দিকে হাঁটবে? একি! লাইন ধরে আলো হাতে হেঁটে আসছে যেন কেউ। ওই লাইনেই তো একটু আগে সেই বীভৎস ঘটনা....। লাইন থেকে নেমে যেন এদিকেই আসছে লোকটা। অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে রেলের পয়েন্টসম্যানদের মতো নীল প্যান্ট কূর্তা পরা। লণ্ঠনের আলোয় খানিকটা জায়গায় আলো পড়ছে। বিলুর কাছাকাছি হতেই লোকটা লণ্ঠনটা নিজের মুখের সামনে ধরল। কী বীভৎস মুখের চেহারা। মরা ছাগলের মতো চোখ দুটো। বিলুর দিকে চেয়ে খুক খুক করে হাসল যেন! ছুট ছুট ছুট! লাইন পার হয়ে মাঠ ভেঙে বিলু মরীয়া ছুট লাগাল। পিছনে থপ থপ ভারি পায়ের আওয়াজ আর সমানে সেই খুক খুক হাসি!

পরের ঘটনা আর বিলুর মনে নেই। জ্ঞান হলে দেখল বাড়িতে শুয়ে আছে। পাড়ার ডাক্তার শিখরেশজেঠু মাথার কাছে বসে আছেন। পাশে ঠাকুমা। দূরে দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে। ঘরের মধ্যে ভিড় করেছে পাড়ার আরও অনেকেই। সুস্থ হয়ে উঠতে বিলুর বেশ কয়েকদিন লেগেছিল। সুস্থ হওয়ারও বেশ কিছুদিন পর একদিন শিখরেশজেঠুর মুখে শুনেছিল ভাঙা কেবিনের ভূতের কথা। পয়েন্টসম্যানটা ঐ কেবিনের সামনেই ট্রেনে কাটা পড়েছিল। সে অনেকদিন আগের ঘটনা। লোকটা সন্ধ্যে হলেই নেশা করত। যেদিন কাটা পড়ে সেদিনও নেশার ঘোরেই ছিল। তারপর তো কেবিনটাই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আরও পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল তফাতে। শুধু পড়ে আছে পরিত্যক্ত ভাঙা কেবিন ঘরটা। আর সেখানে রয়ে গেছে অপঘাতে মরা সেই পয়েন্টসম্যানের প্রেতাত্মা।

অন্ধকার রাতে সেই মেল ট্রেনটা গেলেই দুর্ঘটনার রাতের মতো দৃশ্য অনেকেই আজও দেখতে পায়। রাতবিরেতে লাইনের ধার দিয়ে আসতে আসতে অনেকেই তার মুখোমুখি হয়েছে। মানুষ দেখলেই খুক খুক করে হাসে। লণ্ঠনের আলো মুখের কাছে এনে বীভৎস মুখটা দেখায়। ভাঙা কেবিনটাই তার এখন বাসাবাড়ি।

ছবি: সুফি

নিউবেংগলের নতুন বই

অদ্ভুত গোয়েন্দা

রাধারমণ রায়

দাম: ১৮ টাকা মাত্র

গোয়েন্দা গণেশ হালদারের গোয়েন্দাগিরি সত্যিই অদ্ভুত রকমের। সাহস, বুদ্ধি আর তৎপরতা—এই তিনটি গণেশ হালদারের সাফল্যের চাবিকাঠি। আর গণেশ হালদার মানুষটিও ভারী অদ্ভুত। সেই অদ্ভুত গোয়েন্দার কীর্তিকলাপের কথা পড়তে পড়তে তোমরা রোমাঞ্চিত হবে, সংখ্যার রহস্য ভেদ করার আনন্দে বিভোর হবে। সেই সংগে গুপ্তধন খুঁজে বের করার উন্মাদনা, সেই গুপ্তধনের সন্ধানে আসা একদল ক্রিমিনালের সংগে লড়াই-এর উত্তেজনা তোমাদের টানটান করে তুলবে।

বিপন্ন প্রকৃতি

ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী

দাম: ২৮ টাকা মাত্র

বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি নিয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সম্মতরূপে কোনও বই আজ অবধি লেখা হয়নি। বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতি ও বৃক্ষ প্রজাতি প্রকৃতির বুক থেকে নিঃশেষ হওয়ার কারণ কী তাও জানা যাবে এই বইটি থেকে। এ সব বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির ভারসাম্য মানুষের কী কাজে লাগে—'বিপন্ন প্রকৃতি' সে সম্পর্কে সুন্দর ভাবে আলোকিত করেছে প্রকৃতি বিজ্ঞানী লেখকের কলমে। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এই সব প্রাণীদের সংরক্ষণ যে প্রয়োজন সে কথা বইটির পাতায় পাতায় সুচারুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী বিজ্ঞানীর কলমে।

নিউ বেংগল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ;
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

বিলির অদ্ভুত খেলা সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিলো

ফেলে বুট

(৫৭)

প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড সট কিনের এক জোড়া পুরোনো বুট খুঁজে পেয়েছিলো বিলি ডেন। বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। একদিন বিলি বাধ্য হলো স্কুল দলের পক্ষে রাগবি খেলতে। ডেড সটের বুট পরে খেলতে নেমে বিলি ফুটবলের ধাঁচে রাগবি খেলতে আরম্ভ করলো....

আমি তো বিলিকে বসিয়ে দেবো ভাবছিলাম... কিন্তু বিলির খেলা দেখতেই দেখছি সকলে ছুটে আসছে !
মনে হচ্ছে ছেলেরা বিলির এ ফুটবলের কায়দায় রাগবি খেলাটাই পছন্দ করছে....।
স্কুলের হেডমাস্টারমশাইও খেলা দেখছিলেন....
আশ্চর্য, এতো উৎসাহ তবু ওরা কেন ফুটবল খেলে না বলুন তো ?
আগে তো ফুটবলই খেলা হতো। খুব ভালো দল ছিলো। বিলি ছিলো স্কুলের স্টার প্লেয়ার....
রাগবি ম্যাচ শেষ হয়ে যাবার পর....
এই বিলি, হেড স্যার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান ...শিগগির যাও।
আমায় ডাকছেন ? আমি....আমি তো কেনো অন্যায় করিনি। আমি তো রাগবি খেলতে বাধ্য হয়েছিলাম !
বিলি ভয়ে ভয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলো...
বিলি আজ তুমি ভালোই খেলেছো....যদিও একে ঠিক রাগবি খেলা বলা চলে না !
দুঃখিত স্যার। আমি কোনোদিন রাগবি খেলিনি। হাত দিয়ে বল ধরতে গেলেই মনে হচ্ছিলো হ্যান্ডবল করে ফেলছি....
তুমি রাগবি খেলতে নেমে ফুটবল খেলছো জেনে অনেক ছেলে দেখতে এসেছিলো। রাগবি খেলায় কোনোদিন এতো দর্শক হয়নি...
আসলে আমাদের স্কুলে ফুটবল খেলাটাকেই সকলে পছন্দ করতো স্যার !
সোমবার সকালে স্কুলের প্রার্থনার পর....
শোন, ক্লাশে যাবার আগে আমি তোমাদের একটা ভালো খবর দিচ্ছি....
কি ভালো খবর রে ?
উনি বোধহয় এবার ব্যালে ক্লাশ শুরু করতে চান... হিঃ হিঃ...
আমি স্কুলের রাগবি দলের পাশাপাশি ফুটবল দলও আবার চালু করার কথা ভাবছি....
আমরা যদি এখনই শুরু করি স্কুল কাপে খেলতে পারবো...
হু....র....রে....এ....এ !
ফুটবল....আবার.... দারুণ....দারুণ !
শনিবার রাগবি ম্যাচে বিলির খেলা দেখেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি....তাই বিলিকেই ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন করলাম !
আমায় কিন্তু দলে রাখিস বিলি !
বিলি....তুই ক্যাপ্টেন....
আমি.... ক্যাপ্টেন ! স্কুল দল আবার ফুটবল খেলবে !
বিলি ক্যাপ্টেন, তাই তাকে স্কুল কাপে খেলার জন্যে দল গড়তে বলা হলো....
আঠারো জন....তার মানে সাতজন অতিরিক্ত.... বিগসকে দরকার নেই ....জোন্স....সিম্পসন.... গ্রেগ....বাদ....
পরদিন লিস্টটা টাঙিয়ে দিলো বিলি....
এ কী ! সিম্পসনকে বাদ দিয়েছে !
জানতাম ওদের পছন্দ হবে না। এবার বোধহয় নতুন কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো আমি !
নিজেকে অবশ্য দলে রেখেছে।
এই দল মেয়েদেরও হারাতে পারবে না !
কি হবে এবার ? জানতে পারবে শুকতারার পৌষ সংখ্যায়

বাহাদুর স্পাইক

আরতি বসু

একটা মাত্র তাঁবু ছাড়া পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোথাও কিছু নেই। সামনে পিছনে বাঁয়ে ডাইনে শুধু বরফ আর বরফ। এই ধূ ধূ বরফের রাজ্যে গজরাতে গজরাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাক্ষুসে হিমেল হাওয়া। তারই ঝাপটায় একরকম ফাটা ফাটা বিশ্রী শব্দ উঠছে তাঁবুর ক্যানভাসে।

এ সব কোনো কিছুই বোধহয় কানে যাচ্ছে না জ্যাক ওব্রায়েনদের। ওঁরা ছ জন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসে আছেন তাঁবুর মধ্যে। চুপচাপ, গম্ভীর। কেউ কারুর দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছেন না। গরম চা কখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, এক চুমুকও খাওয়া হয়নি। কাপ নামিয়ে রেখে হঠাৎ উঠে পড়লেন জ্যাক। অস্থির পায়ে তাঁবুর দরজা পর্যন্ত গেলেন, ফিরে এলেন। বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরালেন, নিবিয়ে ফেললেন তক্ষুণি। তারপর আচমকা ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, না, এ হয় না, কিছুতেই হয় না।

চমকে উঠলেও দলনেতা ল্যারী গোল্ড গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় বললেন, এ ছাড়া উপায় কি? ভুলে যেও না এখনও পঞ্চাশ মাইল পথ বাকি। তাছাড়া আমরা সবাই জানি এরকম একটা পরিস্থিতি হতেই পাবে।

হ্যাঁ জানি, সব জানি সব জেনেই তো এসেছি এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দেশে। তবু–

তবু মন মানছে না। শুধু জ্যাক নয়, দলের অন্য পাঁচজনেরও। ওঁদেরও মন বলছে, এ কিছুতেই সম্ভব নয়, কিছুতেই নয়। অথচ নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। ওঁদের পায়ের কাছে পড়ে আছে চকচকে একটা রিভলভার। এখন লটারি হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে তাকেই ওটা তুলে নিতে হবে। গুলি করতে হবে ওঁদেরই সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুদের একজনকে। করতেই হবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই বাঁচার। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? অসহায় মানুষগুলির চোখের সামনে যে কেবলই ভেসে উঠছে গত এক বছরের খুঁটিনাটি কত ঘটনা.

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরের এক সকাল। দক্ষিণ সাগরের বুকে ভেসে বেড়ানো চাঁই চাঁই বরফের পাশ কাটিয়ে খুব সাবধানে উপকূলের দিকে এগোচ্ছিল দুটো জাহাজ। অ্যাডমিরাল রিচার্ড ই বায়ার্ড যাচ্ছেন দক্ষিণ মেরু অভিযানে। বাতাসে এখনও গুঁড়ো গুঁড়ো কুয়াশা। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ঘূর্ণিপাক। উত্তেজনায় টানটান জাহাজের প্রত্যেকটি মানুষ। প্রায় পৌঁছেই গেছেন তাঁরা। তবু মাঝে মাঝে বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে উঠছে ট্যাং.... ট্যাং.... ট্যাং .. ট্যাং. । সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ছে ইঞ্জিনঘরে। আবার তার পরেই বিপদ কেটে যাওয়ার সঙ্কেত। আসলে যে কোনো মুহূর্তেই মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, তাই এত সাবধানতা। বেলা আর একটু বাড়তেই কুয়াশা কেটে গেল, চোখের সামনে ভেসে উঠল বরফে ঢাকা মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা। স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে তাকিয়েই রইলেন সকলে। যার কথা এতদিন শুধু কানে শুনেছেন, যাকে শুধু ছবিতে দেখেছেন এখন তাকেই চোখের সামনে দেখে যেন হারিয়ে ফেলছেন নিজেদের। কী বিশাল! কী নিস্তব্ধ! সাদা বরফের কী চোখ ঝলসানো রূপ!

যাই হোক ঘোর কাটতে কোমর বাঁধলেন ওঁরা। জাহাজের মাল সব নামিয়ে ফেলতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মোট ছেচল্লিশ জন অভিযাত্রী। অনেকদিন থাকবেন এই জনপ্রাণীহীন বরফের মহাদেশে। দু তিন বছরও হতে পারে। কাজেই খাবার-দাবার পোশাক-আসাক, ওষুধ-পত্র তাঁবু-স্লেজ ইত্যাদি জিনিসপত্র এসেছে প্রায় দেড় হাজার টনের মতো। আর এসেছে একশ পঁচিশটা কুকুর। জাতে হাস্কি। সীমাহীন

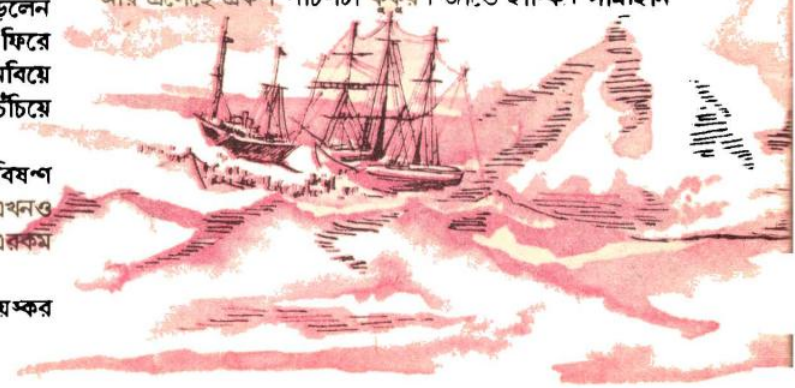

বরফের রাজ্যে একমাত্র হাস্কিরাই পারে স্লেজ টানতে, মাল বইতে। হাস্কি ছাড়া মেরু অভিযান অসম্ভব। এতদিন ধরে জাহাজের খাঁচার মধ্যে আটকে থেকে ওরা হাঁফিয়ে উঠেছিল। জাহাজ কূলে ভেড়ার পর ওদের ছেড়ে দেওয়া হলো সবার আগে। ছাড়া পেয়ে ওরা আহ্লাদে আটখানা। বরফের ওপরেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচিয়ে সরগরম করে তুলল চারদিক। ওদের হৈচৈ অভিযাত্রীদেরও চাঙ্গা করে তুলল অনেকটা।

এদের মধ্যে একটার নাম স্পাইক। আন্টার্কাটিকাতে পা দিয়েই স্পাইক অভিযাত্রীদের বুঝিয়ে দিল কুকুর বলে তারা কেউই হেলাফেলার বস্তু নয়। স্পাইকের চেহারাটাও অন্যদের থেকে একটু আলাদা। স্লেজ টেনে টেনে বুকটা খুব চওড়া আর মজবুত হয়ে উঠেছে। পা-ও তাই। থাবাগুলো অস্বাভাবিক বড়, প্রায় মানুষের পাঞ্জার সমান। ছাই রঙের রেশমী লোম এত ঘন যে দক্ষিণ মেরুর ভয়ংকর শীতেরও সাধ্য নেই সহজে তার ভেতর ঢোকে। ছোট্ট মাথার ওপর ছোট্ট ছোট্ট তেকোণা কানদুটো সর্বদাই হুঁশিয়ার। চোখদুটো কিন্তু অসম্ভব শান্ত আর গভীর। ও যখন পনেরো বিশটা হাস্কিকে নিয়ে এক লাইনে চলতে থাকে তখন মনে হয় যেন ওস্তাদ সেনাপতি যুদ্ধে যাচ্ছে। আবার যখন দুষ্টুমি চাপে মাথায় তখন দলটার আগে আগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আর পেছনের সবাই এ ওর ঘাড়ে পড়ে যায় হুড়মুড় করে। কাজের সময় কিন্তু স্পাইক খুব গম্ভীর, একটুও ইয়ার্কি ফাজলামি নেই তখন।

জাহাজ থেকে মালপত্র নামানোর পর বায়ার্ড জানালেন যে ওঁদের মূল শিবির হবে সমুদ্র উপকূল থেকে পনেরো মাইল ভেতরে। শুরু হলো মালপত্র বওয়ার কাজ। দেড় হাজার টন মাল বরফের ওপর দিয়ে পনেরো মাইল টেনে নিয়ে যাওয়া কি সহজ কথা! তবু সবই হয়ে গেল ঠিকঠাক এবং খুব অল্প সময়ে। স্পাইক তার দলবল নিয়ে প্রায় অসাধ্য সাধন করে ফেলল। মালপত্র ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর জাহাজ ফিরে গেল গভীর সমুদ্রে। সেখানেই অপেক্ষা করবে এঁদের জন্য। কূলের কাছে থাকলে তো শীতের সময় বরফের চাপে গুঁড়িয়ে শেষ হয়ে যাবে। জাহাজ চলে যাওয়ার পর অভিযাত্রীরা একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্পাইকের জন্য মন মেজাজ হাল্কা হতে দেরি হলো না। স্পাইক তাঁদের বুঝিয়ে দিল, আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি তো আছি।

এরপর তিন মাস ধরে শুধু কাজ আর কাজ। শীত আসছে। দক্ষিণ মেরুর শীত। দিনের আলো নিভে যাবে ছ মাসের জন্যে। ঝাঁপিয়ে পড়বে তুষার ঝড়। তাই তার আগেই বরফের নিচে তৈরি আস্তানায় গিয়ে ঢুকতে হবে সদলবলে।

সব ঠিকঠাক গোছগাছ করে অভিযাত্রীরা যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঠিক তখনই মারাত্মক অসুখে পড়ে গেল স্পাইক। এই তিন মাস ধরে বেচারা নিজেকে নিঃশেষ করে খেটেছে। বরফগলা জলের মধ্যে দিয়ে কতবার ছুটে ছুটে গেছে এসেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছে হিম হাওয়ার মুখে, ভিজে সপসপে অবস্থাতেও একা দু তিনটে হাস্কির কাজ করে দিয়েছে। তারই ফল। ওর সেবাযত্নের অবশ্য ত্রুটি হলো না। অভিযাত্রীরা সবাই পালা করে নজর রাখলেন। তবু গোটা শীতকালটা লেগে গেল স্পাইকের সেরে উঠতে। ওর অসুখে অভিযাত্রীরা সতর্ক হয়ে গেছেন অন্য হাস্কিগুলোরও সম্বন্ধে। তাদেরও যত্নআত্তি করছেন। চরম বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে দিন কাটাতে কাটাতে অদ্ভুত একটা বন্ধুত্ব জমে উঠেছে মানুষে পশুতে। জীবন যে সকলেরই প্রিয়।

অক্টোবর মাসে দিনের আলো ফিরে এলো। অ্যাডমিরাল বায়ার্ড সবাইকে ডেকে বললেন, আমি এবার যাব দক্ষিণ মেরু কেন্দ্রে। এখান থেকে যেতে আসতে আঠারোশ মাইল। আপনাদের মধ্যে থেকে ছ জনের একটা দল স্লেজ নিয়ে যাবেন আগে। নেতৃত্ব দেবেন লারি গোল্ড। আপনাদের কাছ থেকে ভালো আবহাওয়ার খবর পেলেই আমি আমার এয়ারপ্লেন নিয়ে রওনা হব। কাজেই দেরি না করে চটপট তৈরি হতে হবে। হাস্কিদের মধ্যে সবথেকে শক্তসমর্থদের বেছে নিতে

হবে। স্পাইককে নিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু ও এখনও দুর্বল। এত ধকল সহ্য করতে পারবে না। তবে আমার মনে হয় ওর সঙ্গে যে দলটা সবসময় ছোটে তাদের নেওয়াই ভালো।

চারদিন পরে রওনা হলেন ল্যারি, তাঁর পাঁচজন সঙ্গী, একদল হাস্কি আর ষোলশ পাউন্ড মাল নিয়ে। ওঁদের তোড়জোড় শুরু হওয়া থেকে রওনা হওয়া পর্যন্ত সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল স্পাইক। ওর শ্রান্ত চোখে ভীষণ উদ্বেগ আর অস্থিরতা। ল্যারিরা পরে শুনেছিলেন, ওঁদের বেরিয়ে পড়ার মাসখানেক পর হঠাৎ একদিন ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল স্পাইক। অনেক কষ্টে ওকে ধরে আনা হয়েছিল।

মেরুকেন্দ্রের কাছাকাছি পৌছতে ল্যারিদের খুব বেশিদিন লাগল না। নিরাপদেই পৌছলেন। কেয়ার্ডকে তাঁর এয়ার প্লেন নিয়ে মেরুকেন্দ্র ঘুরে চলে যেতেও দেখলেন। তারপর ফেরার পথ ধরলেন ওঁরা। আসাটা যত নির্বিঘ্নে হয়েছিল ফেরাটা কিন্তু ততই কঠিন হয়ে পড়ল। কারণ তাঁরা সকলেই তখন পথশ্রমে শ্রান্ত। এক আধ মাইল তো নয়। পুরো ন'শ মাইল বরফ ভেঙে এসেছেন। কুকুরগুলোকে এমনিতে প্রফুল্ল দেখালেও ওরা আর স্লেজ টানতে পারছে না। মাঝে মাঝে ওদের কষ্ট কমাবার জন্য ল্যারিরা নিজেদের জুতে নিচ্ছিলেন স্লেজের দড়িতে। কিছু কিছু জিনিস ফেলেও দেওয়া হলো ওজন কমাবার জন্যে। তবু যেন রাস্তা ফুরোতেই চায় না। এদিকে রসদে টান ধরেছে। কুকুরগুলো ধুঁকছে। এখনও একশ মাইল। কী হবে এবার? তুষার সমাধি? শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ওঁরা এগোলেন আরও পঞ্চাশ মাইল। হাওয়ার দাপট ক্রমশ বাড়ছে। এই হাওয়া ঠেলে পঞ্চাশ মাইল পেরোতে কম করে সাতদিন লাগবে। খাবার যা আছে তাতে বড়জোর দুটো দিন চলবে। তারপর? না খেয়ে এই শীত এই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে যুঝবেন কি করে? খবর পাঠালেও সাহায্য আসতে আসতে ওঁরা শেষ হয়ে যাবেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ওঁরা ঠিক করলেন হাস্কিদের মধ্যে থেকে, একটাকে মেরে মাংসের ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে ক'দিন বাদে আরেকটাকেও। এ ছাড়া নিজেদের বাঁচাবার আর উপায় নেই। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব! কি করে! কোনো মানুষ কি এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে! ইস এই সময় যদি স্পাইকটা কাছে থাকত! একটা উপায় নিশ্চয়ই করতে পারত সে।

হঠাৎ তাঁবুর বাইরে গলা ফাটানো ভৌ ভৌ ডাক, সেই সঙ্গে তাঁবু আঁচড়ানোর শব্দ। এত জোরে চিৎকার করার ক্ষমতা তো একটা হাস্কিরও নেই। বিস্ময়ে অভিযাত্রীরা এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন এমন সময় সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে তাঁবুর দরজার তলা দিয়ে গলে ঝাঁপিয়ে এল স্পাইক!

স্পাইক তুই! কেমন করে এলি? কি করে রাস্তা চিনলি? আর কে এল সঙ্গে?

কেউ না, কেউ আসেনি ওর সঙ্গে। ক্যাম্পে বসেই বিপদের গন্ধ পেয়েছে স্পাইক। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়েছে। ও একাই এসেছে পঞ্চাশ মাইল বরফ ভেঙে। রোগা শরীরে এখনও লোম ঘন হয়ে ওঠেনি। মাথাটা আরও ছোট্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু উৎসাহে ঘাটতি নেই এতটুকু। ওকে দেখে অভিযাত্রীদের মনে যেন উৎসাহের জোয়ার এসে গেল। ঝিমিয়ে পড়া হাস্কিগুলোও চনমনিয়ে উঠল। ল্যারি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রিভলভারটা। সঙ্গীদের বললেন আর ভয় নেই। আর কাউকে হারাতে হবে না। নেহাৎ দরকারী জিনিস ছাড়া আর সব কিছু ফেলে দাও। স্পাইককে বাঁধ সবার আগে প্রথম স্লেজটায়। একটা সেকেন্ডও আর নষ্ট করব না আমরা। চল, বেরিয়ে পড়ি, এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।

স্পাইকের বুকে স্লেজের লাগামটা বেঁধে দিতেই সে তার নিজের ভাষায় যাত্রার সঙ্কেত জানিয়ে ছুটতে শুরু করল।

স্পাইক ছুটছে, হাস্কিগুলো ছুটছে। বরফ কিংবা হাওয়া এখন কোনো বাধাই নয় ওদের কাছে। অভিযাত্রীরাও জানেন কোনো বিপদই আর ওঁদের ছুঁতে পারবে না।

ছুটতে ছুটতে সব্বাইকে নিয়ে পঞ্চাশ মাইল বরফের পথ পেরিয়ে মূল শিবিরে পৌছে গেল স্পাইক ঠিক তিন দিনের মাথায়।

(জ্যাক ওব্রায়েনের 'এ ডগ নেমড্ স্পাইক' অবলম্বনে।)

ছবি : সুব্রতকুমার হাজরা

জানো কী

- লোডশেডিং। লিফট অচল। সিঁড়ি বেয়ে ছতলায় উঠতে লাগলেন লেখক। অন্ধকার সিঁড়ি ধরে উঠছেন.....হঠাৎ তিনি.....কি দেখলেন?
- ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন পঞ্চানন ঠাকুর। এ কী দেখলেন তিনি! এ কিশোর তো তাহলে আর পাঁচটি ছেলের মতো নয়.....এ নিশ্চয়ই.....কি দেখলেন পঞ্চানন ঠাকুর?
- সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। গাঁয়ে পৌছুতে এখনো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। চারদিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলো সে। আর তারপরই.....কি হলো?
- দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ.....আতঙ্কে দুই বোন কেঁপে উঠলো.....এ ওর, ও এর মুখের দিকে তাকায়.....আবার ঠুক ঠুক শব্দ.....আর তারপরই.....কি হলো?
- ছেলেটাকে সকলেই ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন.....ছেলেটাও তাই কাউকে পরোয়া করতো না.....তারপর একদিন.....কি হলো?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে পৌষ মাসের শুকতারায়, সেই সঙ্গে পাবে, আরো অনেক কিছু যা তোমাদের চমকে দেবেই। স্বর্ণখনির অন্তরালে, বাঁটুল, হাঁদাভোঁদা, বাহাদুর বেড়াল তো আছেই। খেলার পাতা ভরা থাকবে রঙিন ছবি আর নানারকম লেখায়।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

দেখবেন, ওর জীবনের স্বপ্ন যেন মিলিয়ে না যায়।

স্বপ্নকে সার্থক বাস্তব রূপ দিন শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধির সুযোগ নিন।

আপনার শিশুকে দিন এমন এক উপহার, যা ওর বয়স বাড়ার সংগে সংগে তরতরিয়ে বাড়তে থাকবে। ইউনিট ট্রাস্টের শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধিতে বিনিয়োগ করুন। ও যখন 21 বছরে পড়বে, তখন আপনার লগ্নিকৃত ঐ টাকা সুদে-আসলে বেড়ে এমন এক অংকে পৌঁছবে, যা ওকে জীবনে ও যা করতে চায় তাতে সাহায্য করবে।

উপহার হিসেবে আপনি ইচ্ছামত একটা থোক টাকা ওকে দিতে পারেন। অথবা প্রতি বছরে কিছু করে টাকা এতে জমা করতে পারেন। এই দুটি বিকল্পের যেটাই আপনি বেছে নিন, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে 21 বছর বয়সে আপনার শিশু লাখপতি হয়ে যাবে (আবার দরকার পড়লে ও 18 বছর বয়স হলেই টাকা তুলতে পারবে)।

ইউনিট ট্রাস্টের শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি। সামান্য পরিকল্পনা এনে দিতে পারে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

আবেদনের ফর্ম ইউনিট ট্রাস্ট শাখাসমূহে, সকল ব্যাঙ্কে এবং জমা কেন্দ্রগুলিতে গ্রহণ করা হবে।

আমাদের আবেদনের ফর্ম-তথা-পুস্তিকার জন্য যেকোনো ইউনিট ট্রাস্ট শাখা, প্রধান প্রতিনিধি অথবা এজেন্টের সংগে যোগাযোগ করুন।

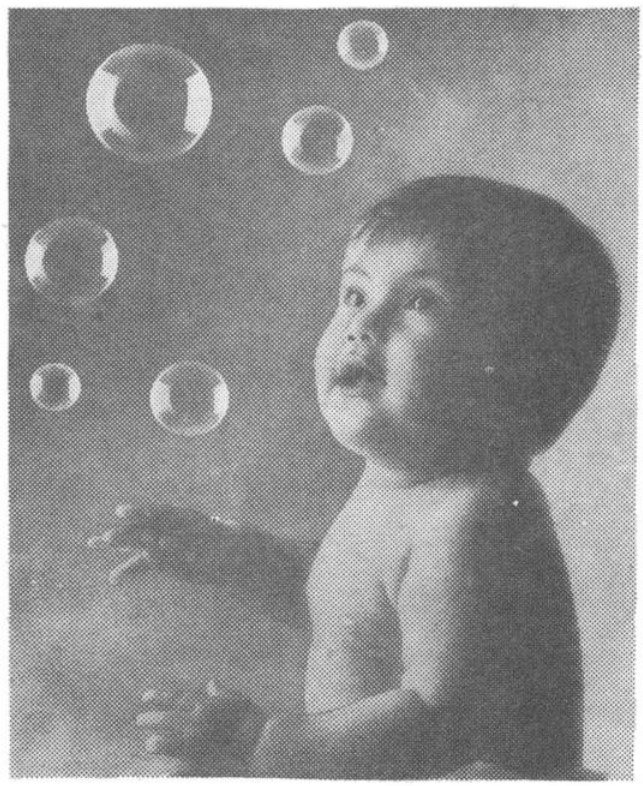

শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি

~~13%~~ 14% ডিভিডেন্ড

বোনাস প্রতি

~~5~~ 3 বছরে

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

22 মিলিয়নেরও অধিক ইউনিট হোল্ডারের সেবায়

সব সিকিওরিটি বিনিয়োগেই বাজারগত ঝুঁকি রয়েছে। বিনিয়োগের পূর্বে আপনার বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা অথবা এজেন্টের সংগে পরামর্শ করে নিন।

Sista's-UTI-1992-BEN R

Registration No W. B./E/C.—30 November '92 "Suktara"